লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭১ বর্ষ ■ ১০ম সংখ্যা

১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ ■ ১ জিলহজ্জ, ১৪২৯ হিজরি

৩০ নবুওত, ১৩৮৭ হিঃ শাঃ ■ ৩০ নভেম্বর, ২০০৮ ঈসাব্দ

আহমদীয়া খিলাফত শতবার্ষিকী জুবিলী ১৯০৮-২০০৮

LOVE FOR ALL
HATRED FOR NONE

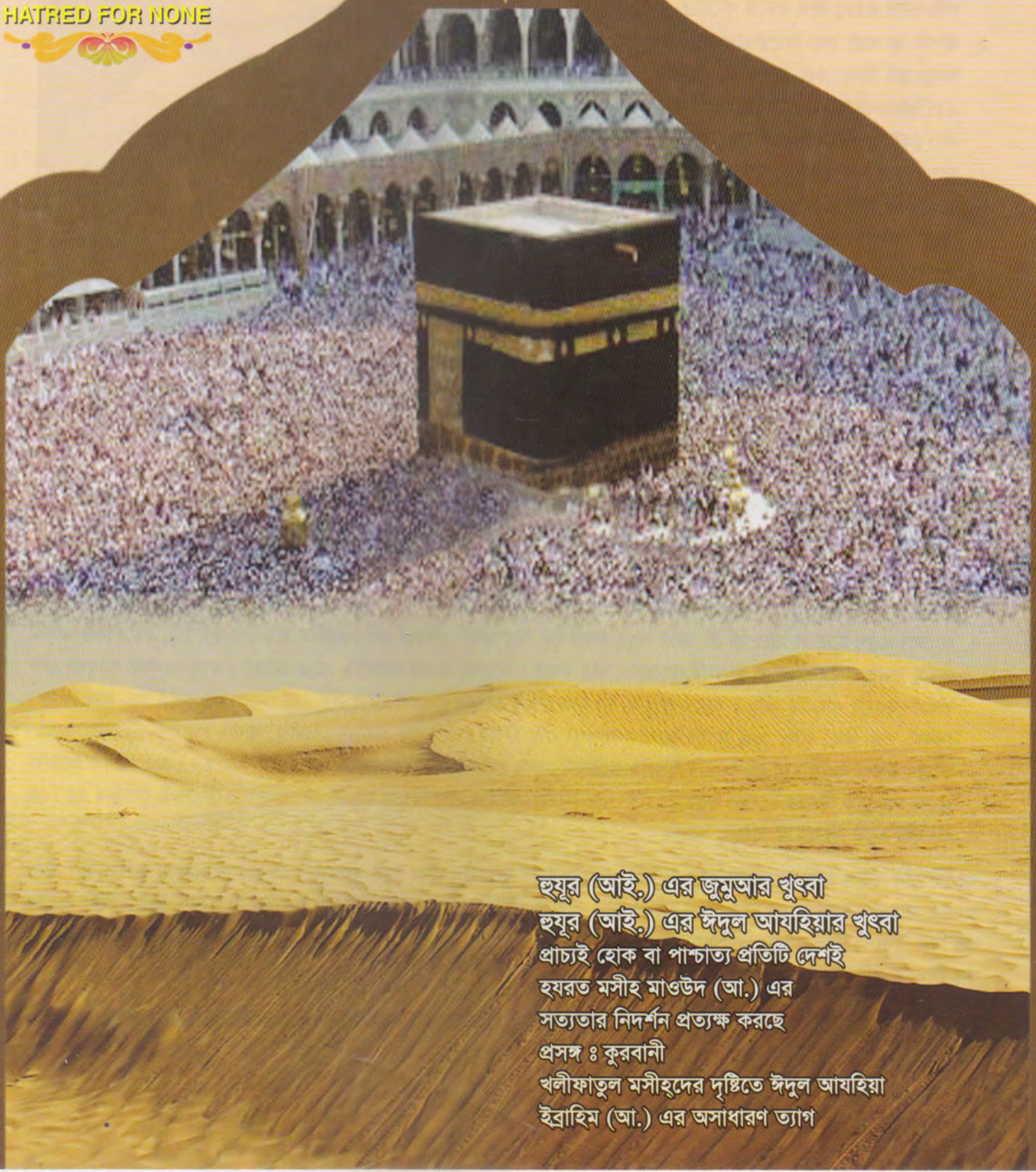

হুযূর (আই.) এর জুমুআর খুৎবা

হুযূর (আই.) এর ঈদুল আযহিয়ার খুৎবা

প্রাচ্যই হোক বা পাশ্চাত্য প্রতিটি দেশই
হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর
সত্যতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করছে

প্রসঙ্গ ঃ কুরবানী

খলীফাতুল মসীহ্‌দের দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া

ইব্রাহিম (আ.) এর অসাধারণ ত্যাগ

আপনার সন্ধানে আছি!

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ)

১. আপনি কি পরিশ্রম করতে জানেন? এরূপ পরিশ্রম যে, তের-চৌদ্দ ঘন্টা পর্যন্ত প্রত্যহ কাজ করতে পারেন?

২. আপনি কি সত্য কথা বলতে জানেন; এরূপ সত্য কথা যে, কোন অবস্থাতেই মিথ্যা কথা বলেন না; এমনকি আপনার অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং প্রিয়জনও আপনার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলতে সাহস করে না এবং কেউ আপনার সম্মুখে নিজের মিথ্যা বীরত্বমূলক কেচ্ছা শুনালে আপনি তার প্রতি নিন্দা প্রকাশ না করে থাকতে পারেন না?

৩. আপনি কি মিথ্যা সম্মানের লালসা হতে মুক্ত? মহল্লার গলি ঝাড়ু দিতে পারেন? বোঝা বহন করে ঘুরে বেড়াতে পারেন? বাজারে উচ্চস্বরে সর্বপ্রকার ঘোষণা করতে পারেন? সমস্ত দিন চলতে এবং সমস্ত রাত জাগ্রত থাকতে পারেন?

৪. আপনি ই'তিকাফ করতে পারেন? এইরূপ ই'তিকাফ যে-
ক) এক স্থানে ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন থাকতে পারেন;
খ) ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তসবীহ্ করতে পারেন এবং
গ) ঘন্টার পর ঘন্টা এবং দিনের পর দিন কোন মানুষের সঙ্গে বাক্যালাপ ছাড়াই থাকতে পারেন।

৫. আপনি কি শত্রু ও বিরুদ্ধাচারী পরিবেষ্টিত অজানা ও অচেনাদের মাঝে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস স্বীয় বোজা বহন করে একা কপর্দকহীনভাবে সফর করতে পারেন?

৬. কোন কোন ব্যক্তি সকল পরাজয়ের উর্ধ্বে থাকে, তারা পরাজয়ের নামও শুনতে পসন্দ করে না। তারা পাহাড় পর্বত কাটতে তৎপর হয় এবং নদীগুলোকে টেনে আনতে উদ্যত হয়ে পড়ে। আপনি কি এ রকম কাজ করতে সদা প্রস্তুত?

৭. আপনার এরূপ মনোবল আছে কি যে, সমস্ত জগত বলবে ভুল-আর 'আপনি বলবেন শুদ্ধ। চারদিক হতে লোকেরা ঠাট্টা করবে কিন্তু আপনি গাম্ভীর্য বজায় রাখবেন। লোক আপনার পশ্চাদ্ধাবন করে বলবে : 'দাড়াও, আমরা তোমাকে প্রহার করবো'। তখন আপনার পদযুগল দ্রুত ধাবমান হওয়ার পরিবর্তে দাঁড়িয়ে পড়বে এবং আপনি মাথা পেতে বলবেন : 'এসো প্রহার কর'। আপনি তাদের কারো কথা মানবেন না। কেননা, তারা মিথ্যা বলে; কিন্তু আপনি সকলকে আপনার কথা স্বীকার করতে বাধ্য করবেন। কেননা, আপনি সত্যবাদী।

৮. আপনি একথা বলবেন না যে, আপনি পরিশ্রম করেছেন, অথচ খোদাতাআলা আপনাকে অকৃতকার্য করেছেন। বরং আপনি প্রত্যেক অকৃতকার্যতাকে নিজের দোষের ফলশ্রুতি বলে মনে করুন। আপনি এটা বিশ্বাস করেন, যে পরিশ্রম করে সে-ই কৃতকার্য হয়। যে কৃতকার্য হয়নি সে আদৌ পরিশ্রম করেনি।

আপনি যদি এরূপ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একজন উত্তম মুবাল্লেগ এবং ভাল ব্যবসায়ী হওয়ার যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু আপনি আছেন কোথায়? খোদার বান্দা অনেক দিন হতে আপনার অনুসন্ধান করেছেন। হে আহমদী যুবক! সেই ব্যক্তির সন্ধান কর নিজ দেশে, নিজ নগরে, নিজ মহল্লায়, নিজ গৃহে, অনুসন্ধান কর নিজ অন্তরে। কেননা, ইসলামের বৃক্ষটি শুষ্ক হতে চলেছে, রক্ত সিঞ্চনে এটি পুনরায় সজীব হবে।

সম্পাদকীয় ঃ

আসে যদি সুখ বিনা কষ্টে
টিকে না কভু তা ধরা পৃষ্ঠে
থাকে যদি মিলন লাগি অন্তর্জালা
ত্যজিবে তবে সে মর্ত্যলোকের পালা

প্রতি বছর মুসলিম উম্মাহ্‌র দোরগোড়ায় আত্মোৎসর্গের মহান শিক্ষা নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকে পবিত্র ঈদুল আযহিয়া। খোদা তাআলার সন্তুষ্টির কাছে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করে অতীতের সকল ভুল-ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে পরবর্তী জীবনে উৎসর্গীকরণের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে চলার প্রত্যয়ী বানিয়ে দেয় এই ঈদ।

ইসলামে রয়েছে তিন ঈদ–এক হলো জুমুআর দিন, দ্বিতীয় হলো ঈদুল ফিতর, তৃতীয় হলো ঈদুল আযহিয়া। ঈদুল আযহিয়া বড় ঈদ বলে পরিচিত কারণ এটি কুরবানীর ঈদ।

হজ্জ সংক্রান্ত ইবাদত আরম্ভ হয় হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সময়ে, (সূরা হজ্জ)। হযরত ইবরাহীম (আ.) খোদা তাআলার আদেশে তাঁর প্রথম পুত্র হযরত ইসমাঈলকে জলশূন্য তরুলতাহীন মক্কা প্রান্তরে বাস করতে ছেড়ে যান, যেখানে জীবন যাপনের কিছুই ছিল না। এটি সেই স্বপ্নের বাস্তব উপস্থাপন ছিল, যাতে তিনি (আ.) নিজ পুত্রকে জবাই করতে দেখেছিলেন। খোদা তাআলা পুত্র কুরবানীর স্থলে বাহ্যিকভাবে তখন পশু কুরবানীর আদেশ করলেন যদিও এর পূর্বে নরবলি'র কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'প্রথম মানুষ ওয়াক্‌ফ' যা খোদার পথে উৎসর্গ করা হয়েছিল। খোদা তাআলা হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে তাঁর মৃত্যুর পর এমন এক নব জীবন দিলেন যে তাঁর প্রজন্ম ধারায় বিশ্ব ধর্ম বিধানের বাহক, শ্রেষ্ঠ আদম সন্তান, নবী গৌরব হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আবির্ভাব ঘটলো। হজ্জে কুরবানীর প্রথা হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর একটা বাহ্যিক চিহ্ন হলেও এদ্বারা এই অতুলনীয় সেই কুরবানীর স্মৃতি চিরদিন অম্লান রয়ে গেল। তাঁর পবিত্র বংশ–বাহ্যিক ভাবে বিরান মক্কা উপত্যকায় সেই অনুপম ফল দান করলো, যার ফুঁৎকারে পৃথিবীতে আধ্যাত্মিকতা সজীব হলো, আজও সজীব আছে এবং চিরকাল সঞ্জীবিত থাকবে। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আযহিয়ার কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (রা.) এর কুরবানীর স্মৃতিকে সচল রাখে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ যুগে আধ্যাত্মিক অবনতি এবং জড়োন্নতিতে মানুষ এই মহান কুরবানীর স্মৃতিকে অনুষ্ঠান সর্বস্বে পরিণত করেছে।

ঈদুল আযহিয়ার নামায আদায় শেষে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর রীতি মোতাবেক পশু জবাই করে শরীয়তের বিধান মতে এর বন্টন করাই হলো ইবাদত। হযরত রসূল করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবনে এরকম ঈদই পালিত হয়েছে।

৩০ নভেম্বর ২০০৮

সূচী পত্র — পৃষ্ঠা নং

- কুরআন শরীফ — ৪
- হাদীস শরীফ — ৫
- অমৃত বাণী — ৬
- জুমুআর খুতবা ঃ — ৭-১৪
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- ঈদুল আযহিয়ার খুতবা ঃ — ১৫-২০
  হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)
- হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর বাণী — ২১
- প্রাচ্যই হোক বা পাশ্চাত্য প্রতিটি দেশই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে — ২২-২৪
  ভাষান্তর ঃ মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্
- প্রসঙ্গ ঃ কুরবানী — ২৫-২৭
  আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান
- খলীফাতুল মসীহগণের দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া — ২৯-৩৪
  মাহমুদ আহমদ সুমন
- হযরত ইবরাহীম (আ.) এর অসাধারণ ত্যাগ — ৩৫-৩৬
  জামালউদ্দিন আহমদ সৌরভ
- সংবাদ — ৩৭-৩৮

প্রচ্ছদ : ডিজাইন – তারেক আহমদ (সবুজ)

ওই রূপ ঈদ পালনই মানুষের দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা ও তাক্‌ওয়া হাসিলের কারণ হয়। এতে পরস্পরের মাঝে ঈমানী-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয় এবং হিংসা-বিদ্বেষ, শত্রুতা দূর হয়ে স্বর্গীয় এক পরিবেশে চরম ও পরম আনন্দ অনুভব হয়, আর এটার নামই প্রকৃত ঈদ। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে কুরআন হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালিত করে না তাদের জন্য এটা ঈদ নয়। তাদের জন্য এ কেবল হৈ-হুল্লা ও মেলা বৈ কিছু নয়।

খোদা তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত অর্থে ঈদুল আযহিয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইবরাহীমি কুরবানীকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়নের তৌফিক দান করুন। আমীন!

সেই সাথে মহান আল্লাহ্ তাআলার সমীপে বিশেষ শুকরিয়া আদায় করি যে তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে আমাদের মাঝে খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া আহমদীয়া-র নিয়ামত শত বছর ধরে জারি রেখে আমাদের বিশেষভাবে অনুগৃহীত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! আমাদের বিনীত দোয়া হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এর আশিসময় ছায়া আমাদের ওপর সদা বিরাজমান থাকুক।

সবাইকে ঈদুল আযহিয়ার মোবারকবাদ

ঈদ মুবারক

কুরআন শরীফ

সূরা হাজ্জ-২২

কুরবানীর নির্দেশ

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٨﴾

৮। 'আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা দাও[১৯৪৬]। তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে আসবে এবং প্রত্যেক এমন বাহনেও (আসবে) যা দীর্ঘ সফরের ক্লান্তির দরুন জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। এগুলো দূরদূরান্ত থেকে গভীর (গর্ত হয়ে যাওয়া) রাস্তা দিয়ে আসবে।

لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴿٢٩﴾

২৯। যেন তারা (সেখানে) তাদের কল্যাণসমূহ[১৯৪৭] প্রত্যক্ষ করে এবং যে রিয্ক তিনি গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর মাধ্যমে তাদের দান করেছেন এ (অনুগ্রহের) জন্য তারা যেন নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহ্‌রনাম স্মরণ করে। সুতরাং এ থেকে তোমরা (নিজেরাও) খাও এবং দুর্গত ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী অভাবীদেরও খাওয়াও।

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۗ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ﴿٣٥﴾

৩৫। আর আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর একটা নিয়মপদ্ধতি[১৯৫২] নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন তারা সেসব গবাদি পশুর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদের দান করেছেন। অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই[১৯৫৩]। সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ কর। আর তুমি সুসংবাদ দাও বিনয় অবলম্বনকারীদের,

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহ্-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহ্‌র নাম নাও। আর (জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে তখন তা থেকে খাও, স্বল্পেতুষ্ট (অভাবী)-দেরও খাওয়াও এবং সাহায্য প্রার্থীদেরও (খাওয়াও)[১৯৫৪]। এভাবেই আমরা এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা ২৩ পৃঃ দেখুন)

হাদীস শরীফ

কুরবানী

❑ নবী করীম (সা.) বলেছেন, হে লোক সকল (জেনে রাখ)! প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছরই কুরবানী করা আবশ্যক (আবু দাউদ ও নাসায়ী)।

❑ আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য লাভ করেছে অথচ কুরবানীর আয়োজন করেনি, সে যেন আমাদের ইদগাহের নিকট না আসে (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ঈদে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধুসর রঙের শিংওয়ালা দু'টি দুম্বা কুরবানী করলেন। এদেরকে তিনি নিজ হাতে জবাই করলেন এবং (জবাই করার সময়) 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বল্লেন। আনাস (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (সা.) (জবাই করার সময়ে) উহাদের পাঁজরের ওপর নিজের পা রাখতে এবং 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবর' বলতে শুনেছি (মুত্তাফিক আলায়হে)।

❑ হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মধ্যে কুরবানীর নিমিত্তে বন্টনের জন্য তাকে (উকবাকে) কতগুলি ছাগল-ভেড়া দিলেন। বন্টনের পর একটি এক বছরের বাচ্চা-ছাগল বাকী থাকলো। তিনি তা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উল্লেখ করলেন। হুযূর বল্লেন, তা দ্বারা তুমি নিজে কুরবানী কর। অপর বর্ণনা মতে , আমি বল্লাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার ভাগে তো মাত্র একটি বাচ্চা-ছাগল থাকলো। হুযূর (সা.) বল্লেন, তুমি তা দ্বারাই কুরবানী কর (মুত্তাফিক আলায়হে)।

❑ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহেই যবাই করতেন (বুখারী)।

❑ হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশক যখন আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে, সে যেন কোন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখসমূহের কিছু না কাঁটে। (মুসলিম)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে দেখে নেই এবং যে পশুর কানের শেষ ভাগ কাটা গেছে অথবা যার কান গোলাকারে ছেদিত হয়েছে বা যার কান পিছনের দিকে চিরে গেছে তার দ্বারা কুরবানী না করি (তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী)।

❑ হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, আমরা যেন শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দ্বারা কুরবানী না করি (ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিংওয়ালা যথেষ্ট বলবান দুম্বা দ্বারা কুরবানী করতেন, যার চোখ কালো মুখ কালো এবং পা কালো (আরবে এরূপ দুম্বাকে খুব সুন্দর বলে মনে করা হয়)। (তিরমিযী, আবু দাউদ নিসায়ী ও ইবনে মাজাহ্)।

❑ হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় দশ বছর অবস্থান করেছেন আর বরাবর কুরবানী করেছেন (তিরমিযী)।

❑ হযরত যায়েদ বিন আকরাম (রা.) বলেন, একদিন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এই কুরবানী কী? হুযূর উত্তর করলেন, তোমাদের পিতা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সুন্নত (নিয়ম)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এতে আমাদের (সওয়াব) আছে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! হুযূর (সা.) বললেন, কুরবানীর পশুর প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে, তারা আবার জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! পশমওয়ালা পশুদের পরিবর্তে কি হবে? (এদের পশম তো অনেক বেশী)। হুযূর (সা.) বললেন, পশমওয়ালা পশুর প্রত্যেক পশমের পরিবর্তে একটি পুণ্য রয়েছে (আহমদ ও ইবনে মাজাহ্)।

[পাক্ষিক আহমদী, ৩১ মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যা থেকে পুণর্মুদ্রিত]

অমৃতবাণী

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

ঈদুল আযহিয়ার সাথে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পারস্পরিক সম্বন্ধ

আজ ঈদুল আযহিয়ার দিন। আর এ ঈদ এমন এক মাসে আসে যাতে ইসলামী মাস শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ পুনরায় মুহররম থেকে নববর্ষ আরম্ভ হয়। এটা একটি বৎসরের কথা যে এমন একটি মাসে ঈদ পালিত হয়ে থাকে। এতে ইসলাম মাস বা যুগ শেষ হয়। এবং এটা এদিকে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আগমনকারী মসীহ্‌র সাথে গভীর পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান। ঐ পারস্পরিক সম্পর্ক কী? এক তো এই যে, আমাদের নবী করীম মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ যুগের নবী ছিলেন। আর তাঁর গোটা জীবন এবং সময় যথাযথভাবে ঈদুল আযহিয়ার মাঝেই যেন কাটছিলো। যেহেতু এ বিষয়টি মুসলমান শিশুরাও অবহিত আছে যে,তিনি শেষ যুগের নবী আর এ মাসও শেষ মাস তাই এ মাস তাঁর ও তাঁর (সা.) যুগের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক রাখে।

দ্বিতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক

দ্বিতীয় পারস্পরিক সম্পর্ক : যেহেতু এ মাসকে কুরবানীর মাস বলে, রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, যেভাবে আপনারা ছাগল, উট, গরু, দুম্বা যবাই করে থাকেন, সেভাবেই ঐ বিগত যুগে আজ থেকে ১৩০০বছর পূর্বে খোদা তাআলার পথে সাহাবাগণ উৎসর্গীত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ঈদুল আযহিয়া তা-ই ছিলো আর এর মধ্যেই মধ্য গগনে সূর্যের আলো দীপ্তিমান ছিলো।

কুবানীর তাৎপর্য

এসব কুরবানী এর শাঁস নয় খোসা। আত্মা নয় দেহ। এ সুযোগ-সুবিধা ও আরাম আয়েশের যুগে হাসি-খুশীর ঈদ পালিত হয়ে থাকে। আর ঈদের পরিণতি হাসি-খুশী নানা ধরনের খাবার দাবারের আয়োজন করাকে ধরে নিয়ে থাকে। মহিলারা এ দিনে সকল প্রকার অলংকার পরিধান করে। ভাল থেকে ভাল কাপড়ে সুসজ্জিত হয়। পুরুষেরা ভাল ভাল পোষাক পরিধান করে থাকে। আর উত্তম খাদ্য একত্রে পরিবেশন করা হয়। এবং এটাকে এমন আনন্দ ও খুশীর দিন মনে করে যে, কৃপণ থেকে অধিকতর কৃপণ লোক আজ মাংস খেয়ে থাকে। বিশেষ করে কাশ্মীরীদের পেট তো ছাগল বকরীর দ্বারা বোঝাই হয়ে যায়। অন্যান্য লোকেরাও আসলে পিছনে পড়ে থাকে না। মোট কথা প্রত্যেক ধরনের খেলা-ধূলা হাসি তামাশার নাম ঈদ মনে করা হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রকৃত তত্ত্বের প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি প্রদান করা হয় না।

গভীর রহস্য

প্রকৃতপক্ষে এ দিনের গভীর রহস্য এটা ছিলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কুরবানীর বীজ বপন করেছিলেন এবং গোপনভাবে বপন করেছিলেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বায়ু হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল ক্ষেত দেখিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বীয় পুত্রকে খোদা তাআলার আদেশে যবাই করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি। এতে গুপ্তভাবে এই

ইঙ্গিত ছিলো যে, মানুষ দেহ মনে খোদার

(অবশিষ্টাংশ ২৮ পৃঃ দেখুন)

জলসাগাহে এবং এর বাইরেও সালামের প্রচলন করুন
প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এমন সৌন্দর্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করুন যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জলসায় আগমনকারীদের জন্য যে সব দোয়া করেছেন সেগুলোর অংশীদার আপনারাও হয়ে যান

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ-

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ২৫ জুলাই ২০০৮ ইং, হাদীকাতুল মাহদী, আলটন হেমশায়ার-এ প্রদত্ত]

আজ সন্ধ্যায় ইনশাআল্লাহ্, যথারীতি উদ্বোধনের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাআত, ইউকে-এর সালানা জলসা শুরু হচ্ছে। এ বছরের জলসা, খিলাফতে আহমদীয়া'র শতবার্ষিকী পূর্ণতা উপলক্ষ্যে গত শত বছরে আল্লাহ্ তাআলার ফযল রহমত ও সাহায্যের বর্ষিত বারিধারার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য একত্রিত হওয়ায়, এ জলসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জলসায় রূপ নিয়েছে। যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ ও মহিলা নির্বিশেষে প্রত্যেক আহমদীর হৃদয়ে এ জলসার বিশেষ এক তাৎপর্য রয়েছে আর এ গুরুত্বকে দৃষ্টিতে রেখে এ বছর জামাআতে আহমদীয়া বৃটেনের ব্যবস্থাপকবৃন্দ দেশের অভ্যন্তর ও বহির্বিশ্ব থেকেও অধিক হারে অতিথি আগমনের আশা রেখে ব্যাপক আয়োজনের চেষ্টা করেছে। আমি আশাবাদী অস্থায়ীভাবে করা এমন বিশাল আয়োজনে সাধারণত যেসব ঘাটতি হয়ে থাকে সে ধরনের ছোট খাট ঘাটতি ছাড়া তেমন কোন বড় ত্রুটি এতে থাকবে না। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে ব্যবস্থাপনা সাধারণভাবে ভালই থাকবে ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এক সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে নিজ কর্মীবৃন্দ তাদের নিজ নিজ কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছেন এবং সেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে যখন একজন আহমদীর ঈমানী উদ্দীপনা যুক্ত হয়ে যায়, কর্মীগণের মাঝে তখন কাজের উন্মাদনা চেপে বসে আর যেভাবে আমি বলেছি এ বছর তো খিলাফত জুবিলীর জলসাও। প্রত্যেক কর্মী, সে শিশুই হোক, বা যুবক কিংবা বৃদ্ধ, সবার মাঝে এক বিশেষ উদ্দীপনা রয়েছে। এ বছর যেখানে যেখানে জলসা হচ্ছে, যেসব দেশেই আমি গিয়েছি, সেই উদ্দীপনা এক বিশেষ রূপে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেটা ঘানা নাইজেরিয়ার মতো পুরাতন জামাআতের জলসা হোক বা বেনিন-এর মতো নতুন জামাআতের জলসা বা আমেরিকা অথবা কানাডার জলসাই হোক।

আমেরিকার আহমদীদের সম্পর্কেও কিছু বলতে চাই। জানিনা, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের আহমদীদের কেন যে এমন ধারণা ছিল যে, সেখানকার জলসায় তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও আমেজ পরিলক্ষিত হবে না যেমনটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পরিলক্ষিত হয়। এখনও আমার নিকট যেসব চিঠি আসছে সেগুলোর অধিকাংশ চিঠির মাঝেই এর উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবত এমন ধারণা জন্ম নেয়ার কারণ এটা ছিল যে, (তারা

ভাবতো) আমেরিকায় যে সামাজিকতা পরিলক্ষিত হয়, আমাদের আহমদীরাও সেই সামাজিকতার শিকার কেননা এক বিরাট সংখক যুবক সেখানেই প্রতিপালিত হয়ে বড় হয়েছে। কিন্তু একেতো এ ধরণের ধারণা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও ভুল, কারণ সেখানকার সাধারণ মানুষ খুব ভাল–আর আহমদীদের বেলায়, যেমনটা আমি পূর্বেও বলেছি, তারা কোন দিক দিয়ে-ই কম না। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার) আর এ সবই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের বরকত।

যা হোক আজ তো ইংল্যান্ড জলসার উল্লেখ হওয়া দরকার। যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তাআলার ফযলে কঠোর আইনী বাধ্যবাধকতার মধ্যে দিয়ে অস্থায়ী ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এবং সংখ্যার দিক থেকেও এত বিশাল আয়োজন কোথাও তো হয় না। গত কয়েক বছর যাবত যেসব জলসা হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে জার্মান ও ইংল্যান্ডের জলসা সমপর্যায়ের আর এ বছর ঘানার জলসা উপস্থিতির দিক থেকে অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

আমি পাকিস্তানের উল্লেখ করিনি কেননা সেখানে তো মুখেমুখে অধিকার, ন্যায়-নীতি ও স্বাধীনতার দাবীকারী সরকার গত ২৪ বছর থেকে আমাদেরকে জলসা করতে দিচ্ছে না। জানি না, এ শান্তিপ্রিয় জামাআত নিয়ে তাদের কিসের এত ভয়? জলসার এ দিনগুলোতে আমি আপনাদের মাঝে এ তাহরীক করতে চাই যে, আপনারা পাকিস্তানের অবস্থার জন্য দোয়া করুন। একতো রাষ্ট্রের সাধারণ অবস্থার জন্যও দোয়া করুন, কেননা আল্লাহ্-ই জানেন শাসনকর্তারা দেশকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে, আর দেশেরই বা' কি করতে চাচ্ছে। গত বছর যখন নির্বাচন হল, মৌলভীরা তখন ক্ষমতা পায় নি, তাই তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী সারা দেশে এর প্রতিশোধ নিচ্ছে এবং বিভিন্ন স্থানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দেশের ভিত্তিকে দুর্বল করার পাঁয়তারা করছে। শাসনকর্তা ও রাজনীতিবিদদের নিকট এদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচিত হয়ে গেছে কেননা তারা দেখেছে, সাধারণ জনগণ নির্বাচনে কিভাবে তাদেরকে প্রতিহত করছে, এরপরও শাসনকর্তারা মোল্লাদের নিয়ে ভয় পাচ্ছে। তাদের বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী কার্যকলাপ কঠোরভাবে অবদমিত করার পরিবর্তে, তাদের কাছে এমন ভাবে নতি স্বীকার করে আছে এবং তাদের সাথে এমনভাবে আলোচনা করছে যে, মনে হয় তাঁরা যেন তাদেরই (মোল্লাদের) অধিনস্ত। যাই হোক, আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দেশের ওপর রহম করুন। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, সেখানকার আহমদীরা যেন তাদের অনুষ্ঠানসমূহ স্বাধীনভাবে উদযাপন করতে পারে, যেন শান্তিতে শ্বাস নিতে পারে, নিজেদের জলসাসমূহ পরিপূর্ণ ভাবগাম্ভির্যতা ও জৌলুসের সাথে পালন করতে পারে, অত্যাচারী আইনের যেন ইতি ঘটে, আল্লাহ্ তাআলা রাষ্ট্রের ঐসব নীতি নির্ধারকদেরকে বিবেক বুদ্ধি দান করুন, যারা এ বিষয়টি বুঝতে পারছে না যে তারা কোন দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং তাদের সাথে কি ঘটবে। এ দিনগুলোতে বিশেষ করে ঐ সকল আহমদী যারা পাকিস্তান হতে এসেছেন, আপনারা পাকিস্তান ও পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য অনেক দোয়া করুন।

আমি আবার UKএর প্রসঙ্গে আসছি, গত জুমুআয় আমি কর্মকর্তাদেরকে তাদের দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, এটা আমার একটা রীতি, এর অর্থ কখনোই এমন নয় যে, কর্মকর্তাগণ সঠিকভাবে কাজ করেন না। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে অন্য যে কোন জামাআতের মত এখানকার কর্মকর্তা ও কর্মীগণও অনেক আন্তরিকতার সাথে কাজ করেন। যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি, এত বিস্তর অস্থায়ী ব্যবস্থাপনা এবং এর জন্য এত বেশী সুদীর্ঘ প্রস্তুতিও কোথাও নেয়া হয় না, যতটা এখানে নেয়া হয়। জার্মানির জলসা যদিও সংখ্যার দিক থেকে UK (যুক্তরাজ্য) জলসার বরাবর কিন্তু তারা জলসাগাহে বেশ সুযোগ সুবিধা পেয়ে যান যেটা এখানে পাওয়া যায় না। গত বছর আল্লাহ্ তাআলা কর্মকর্তা ও কর্মীগণকে এক নতুন অভিজ্ঞতা দান করেছেন। অর্থাৎ মৌসুমী বৃষ্টি, প্রচলিত ধারাবাহিকতাকে বেশ ওলট-পালট করে দিয়েছিল। কিন্তু কর্মকর্তা ও কর্মীগণ আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এমন সমস্যার মাঝেও খুব সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। প্রত্যেক শাখার কর্মীদেরকে তাদের নিজ নিজ গন্ডির মধ্যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আর তেমনি সম্মুখীন হতে হয়েছে গত বছরও।

এ বছর বাহ্যিকভাবে আবহাওয়ার পূর্বাভাস তো ভাল, দোয়া করুন আল্লাহ্ তাআলা যেন ভালই রাখেন। প্রকৃতপক্ষে সকল বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ তো আল্লাহ্ তাআলার হাতে। তাঁর ফযল ব্যতীত তো কোন জিনিস-ই সম্ভব না। তিনি চাইলে তবেই সেটা আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলে প্রমাণিত হয়। মানুষের একটি অনুমান রয়েছে, যার উপর ভিত্তি করে তারা আবহাওয়ার অবস্থার বর্ণনা করে। কিন্তু যেভাবে আমি বলেছি যে, গত বছরের বৈরী আবহাওয়ার কারণে একটা সুফল হয়েছে যে, খোদ্দামরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। এদ্দিন পর্যন্ত তো খোদ্দামরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথে আর শুষ্ক স্থানে কাজ করতে দক্ষ ও পারদর্শী হয়ে উঠেছিল এখন তারা কাদার মাঝে কাজ করতেও অভ্যস্ত হয়ে

গেছে। কেউ একজন বলেছেন "আমাদের শিক্ষক তো গর্তে পড়েও শিক্ষা লাভ করেছেন" কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ফযলে এখানে তো শিক্ষকের কথা নাই, বরং আমাদের খোদ্দামরা যুক্তরাজ্যে বসবাস করার পরও খানা-খন্দকের ব্যাপারে অভিজ্ঞ হয়ে গেছে। আমি তো মনে করি এখন যদি কোন গাড়ি কাদায় আটকা পড়ে তাদের এতটা ট্রেনিং হয়েছে যে, তারা অনায়াসে তা উঠাতে পারবে। যাই হোক, আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, কর্মীগণ তো আল্লাহ্ তাআলার ফযলে অনেক পরিশ্রম করে কাজ করেন এবং ইনশাআল্লাহ্ করবেও, কিন্তু মেহমানদেরও দায়িত্ব রয়েছে যা পালন করা আপনাদের কর্তব্য। সর্বপ্রথম কথা হচ্ছে, এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তাআলার জন্যই এ জলসায় উপস্থিত হওয়া, একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এজন্য সর্বদাই এ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখুন আর এ ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামায আদায় করা এবং শুধু জলসাগাহে বসে চিত্তাকর্ষক কিছু বক্তৃতা শুনা-ই আপনাদের এ আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে না। বরং এ দিনগুলিতে আপনারা সকলে নিজের মাঝে এমন পবিত্র পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করুন, যেন এ দিনগুলোতে কৃত ইবাদত ও নামাযসমূহ জলসায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিগণের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হয়ে যায়। শুধু খুশু-ও-খুজু-এর (চরম বিনয়ের) সাথে নামায পড়লেই হবে না বরং নামাযগুলো সময় মত পড়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে বরং এটা আবশ্যক যে বা'জামাত নামায পড়তে হবে।

এখানে নামায ও জলসার সময়ে দোকানগুলো সাধারণত বন্ধ থাকে, এজন্য নতুন মেহমানগণ এবং পুরাতনগণও ঐ দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। কতক সময় বিনা কারণে নিয়ম ভাঙ্গার চেষ্টা করা হয় আর তাই এভাবে বাড়াবাড়ি করে কর্মীদের জন্যও সমস্যার কারণ হবেন না। এরপর জলসার এ দিনগুলোতে তো সাধারণত জলসাগাহে জামাতে তাহাজ্জুদ নামাযের ব্যবস্থা থাকে এবং লোকেরা এখানে আসেও আর অন্যান্য আবাসস্থলেও সেখানকার অবস্থানকারীরা এ বিষয়ের পা-বন্দি করুন। ইসলামাবাদে সমবেতভাবে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে অনুরূপভাবে, বায়তুল ফুতুহতেও রয়েছে। এসব স্থানেও তাহাজ্জুদ ও ফযর নামাযের পা-বন্দির (নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালনের) চেষ্টা করুন। এছাড়াও অনেক লোক বাসায় অবস্থান করছেন, তাদের আশ-পাশেও যদি নামাযের ব্যবস্থা থাকে, সেখানে যাওয়ার সুব্যবস্থা থাকে এবং ফযর, মাগরিব ও এশার নামাযের আগেই যদি চলে যান তবে মাগরিব ও এশার নামায সেখানকার মসজিদে পড়ার চেষ্টা করুন, লন্ডনের অধিবাসীদের মধ্যে থেকে যারা প্রত্যেক দিন বাড়ি ফিরে যান, তারা নিজেরাও যেন নামাযে পা-বন্দি হন এবং তাদের মেহমানদেরকেও পা-বন্দি করান। যদি নামায ও ইবাদতের দিকে মনযোগ নিবদ্ধ না হয় তবে তো আপনারা, এ জলসার অনেক বড় একটি উদ্দেশ্যের পূর্ণকারী বলে বিবেচিত হবেন না। কোন বক্তৃতা উপকারে আসতে পারে না অথবা এ বক্তৃতার মাধ্যমে জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণের ফলে কোন উপকার সাধিত হয় না, যদি না নামাযের প্রতি পূর্ণ উৎসাহ এবং এর হক (প্রাপ্য অধিকার) আদায়ের উদ্দেশ্যে নামায পড়ার চেষ্টা করেন। এটি খিলাফত জুবিলীর জলসা, এজন্য অনেক বৃহৎ সংখ্যায় লোকজন এসেছে, উদ্দেশ্য হচ্ছে, খিলাফত জুবিলীর বছরের প্রথম জলসা। আমি আগেই বলেছি এবার অধিকাংশরা এ বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এবং এর গুরুত্বকে সামনে রেখে জলসায় শামিল হয়েছে।

সুতরাং, যেমনটি আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতের নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন তিনি মুমিনদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় বদলে দিবেন, তেমনি এ আয়াতে এ বিষয়টিও বর্ণনা করেছেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কোন কিছুর শরিক না করার কারণে তারা এসব নেয়ামতের অধিকারী হবে অর্থাৎ খিলাফতের জন্য দৃঢ়তা দান করবেন অত:পর এসব কথা তাদেরকে আরো বেশি ইবাদতের দিকে আকৃষ্ট করবে।

পরবর্তী আয়াত যেটি এই আয়াতে ইস্তেখলাফের পর রয়েছে সেটার প্রারম্ভেই বলেছেন

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ (النور: 57)

(আন্ নূর ঃ ৫৭) অর্থাৎ ইবাদতের মৌলিক বিষয় এবং শিরক্ না করার প্রথম ধাপ হচ্ছে নামায প্রতিষ্ঠা করা। নামায প্রতিষ্ঠা জিনিসটা আসলে কি? বাজামাত নামায পড়া, দোয়া-অনুনয় ও বিনয়ে সুসজ্জিত নামায পড়া এবং সময় মত নামায পড়া। নামাযের বিপরীতে অন্য যে কোন বিষয়কে তুচ্ছ ভাবা, কোনই মূল্য না দেয়া। সুতরাং এ দিনগুলোতে আগত অতিথি এবং জলসায় অংশগ্রহণকারীগণ, আপনারা আপনাদের নামাযের প্রতি মনযোগী হোন। শুধু এ দিনগুলোতে নয়, বরং এ সময়ে বিশেষভাবে দোয়া করুন এবং চেষ্টা করুন যেন, এ দিনগুলোর নামাযের অভ্যাস আপনাদের জীবনের অংশ হয়ে যায়, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে খিলাফতের রঙে যে নেয়ামত দান করেছেন আমরা যেন তার অংশীদার হই। আমাদের ইবাদত যদি প্রাণবন্ত হয়, তবে তা প্রত্যেক আহমদীর জন্য

ব্যক্তি জীবনেও দৃঢ়তার কারণ হবে এবং জামাআতি ভাবেও দৃঢ়তার কারণ হবে। সুতরাং এ দিনগুলোতে বিশেষ ভাবে নামাযসমূহের সংরক্ষণ করুন, কেননা এটাই আমাদের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "প্রত্যেক উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের মনযোগ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবদ্ধ থাকে" তিনি (আ.) আরো বলেন, "ঈমানের মূল হচ্ছে নামায।"

অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,

وَعَدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে ঈমানদারদের সাথে অঙ্গীকার করেছেন

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ

যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন। তাই প্রত্যেক আহমদীকে এই পুরস্কার ও কল্যাণ লাভের জন্য ঈমানের পথে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, ঈমানের মূল বিষয় হচ্ছে নামায, এই মূলকে দৃঢ়ভাবে ধরার চেষ্টা করা উচিত, বরং তাঁর মূল আমাদের হৃদয়ে এমন ভাবে প্রোথিত করতে হবে যে, যা খুশি হয়ে যাক কিন্তু কোন অবস্থাতেই যেন এ মূলের ক্ষতি সাধিত না হয়, কেননা এর ক্ষতি সাধন করা বা নামাযে দুর্বলতা দেখানোর অর্থ হচ্ছে, ঈমানে দুর্বলতা সৃষ্টি আর যখন ঈমান দুর্বল হবে তখন খিলাফতের সাথে সম্পর্কও হালকা হবে। কাজেই বর্তমানে আপনারা যখন বিশেষ দিনগুলোতে একত্রিত হয়েছেন তখন আপনারা আপনাদের নামাযকে সংরক্ষণ করুন, যাতে আল্লাহ্ তাআলার ওয়াদা মোতাবেক নামাযগুলো আমাদের হিফাযত করে, আমাদের নামাযগুলোতে যেন দৃঢ়তা সৃষ্টি হয় যার ওয়াদা আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের সাথে করেছেন। আমরা যেন আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য পেয়ে সর্বদা তাঁর ঐ নামসমূহের উত্তরাধিকারী হই।

নামাযে দোয়া করার পদ্ধতি ও এর বাস্তবতা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,–" অনুনয় ও বিনয়ের সাথে নামায আদায় করা উচিত।" অতঃপর বলেন,

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (المؤمنون:10)

(সূরা আল মু'মিনুন : ১০) অর্থাৎ এমন লোক যারা তাদের নামায সমূহকে হেফাযত করে, কখনো অনুপস্থিত থাকে না আর মানুষের সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্যও এটি যে, মানুষ যেন নামাযের মূলতত্ত্ব শিখে। স্মরণ রাখা উচিত যে, নামাযই সেই জিনিস, যার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয় এবং সবধরণের বালা-মুসিবত দূর হয়ে যায়। কিন্তু এ নামাযের মাধ্যমে সেই নামাযকে বুঝায় না, সাধারণ লোকেরা প্রথাগতভাবে যে ধরণের নামায পড়ে থাকে বরং এ নামাযের অর্থ হচ্ছে, যার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় কোমল হয় এবং এক অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলার দরবারে অবনত হয়ে এমন মোহিত হয় যে, গলে যাওয়ার উপক্রম হয়, অত:পর এটাও বুঝা উচিত যে, এজন্য নামাযের হিফাযত করা হয় না যে, খোদা তাআলার তা প্রয়োজন, খোদা তাআলার আমাদের নামাযের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তো غَنِىٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ গোটা জগতেরই পরওয়া করেন না। তাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই বরং এর উদ্দেশ্য ও ভেদ কথা হচ্ছে, মানুষ নিজেই নিজের মঙ্গল কামনা করে থাকে। এজন্য তারা আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করে। কেননা এটা সত্য কথা যে, আল্লাহ্ তাআলার সাথে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়াটাই প্রকৃত কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া। সমস্ত পৃথিবী যদি তার শত্রু হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসের আকাংখী হয় তবুও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না আর এমন ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন পড়লে আল্লাহ্ তাআলা লাখ লাখ, কোটি-কোটি মানুষকেও ধ্বংস করেন। স্মরণ রেখো, নামায এমন জিনিস, যার মাধ্যমে পৃথিবীও সুসজ্জিত হয় এবং ধর্মও সুসজ্জিত হয়।

তিনি (আ.) বলেন, "নামায তো এমন জিনিস যে, মানুষ এটা আদায়ের মাধ্যমে সব ধরনের মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা হতে নিজেকে রক্ষা করে কিন্তু এভাবে নামায পড়ার যোগ্যতা মানুষের মাঝে নেই, এ পদ্ধতি খোদা তাআলার সাহায্য সহযোগিতা ব্যতীত অর্জন করা যায় না। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না বিভোর হয়ে দোয়ায় লেগে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের খুশু ও খুজু (চরম বিনয়) সৃষ্টি হতে পারে না। এজন্য তোমাদের দিন রাত মোট কথা কোন এক মুহূর্তও দোয়া শূন্য থাকা উচিত নয়।"

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা পুনরায় আমাদেরকে এমন দিন দান করেছেন, এতে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুন, নিজেদের নামাযসমূহকে অলংকৃত করুন এবং দিন রাত দোয়ার মধ্যে অতিবাহিত করুন। খোদা তাআলার নিকট ঐ সমস্ত নেয়ামত ও পুরস্কার প্রার্থনা করুন, খোদা তাআলা আমাদেরকে তেমন নামায দান করুন যা সব ধরনের মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা হতে রক্ষা করে। এ দিনগুলোতে আমরা যেন এমন দোয়া করার সৌভাগ্য লাভ করি যা, আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টিকে আকৃষ্ট করা অবস্থায় আমাদেরকে সর্বদা তাঁর রহমত ও ফযলের ওয়ারিশ বানাতে থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের বোধোদয় ঘটান এবং

হেদায়াত দান করুন, আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে তাদের জন্য যদি এমনটি নির্ধারিত না থাকে তবে যেন আমাদেরকে সর্বদা তাদের অনিষ্ট হতে বাঁচার উপকরণ দান করতে থাকেন। সুতরাং এদিনগুলোতে একনিষ্ঠভাবে নামায, ইবাদত বন্দেগী ও দোয়ার প্রতি মনযোগী হউন, কারণ এখানে আমাদের একত্রিত হওয়ার এটাই উদ্দেশ্য।

জলসায় আগত প্রতিটি আহমদীকে সর্বপ্রথম এই মূল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ আমি যে কথাটি বলতে চাই, সেটি হচ্ছে জলসার দিনগুলোতে আপনারা সালামের প্রচলন করুন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে সমস্ত আদেশাবলী দান করেছেন সেগুলোর মধ্যে থেকে এটিও একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক আদেশ এবং পরস্পরের মাঝে প্রেম-প্রীতি ও সৌহার্দ বৃদ্ধির উপায়। এরপর আগত মেহমানগণ এ কথাও স্মরণ রাখুন, আমন্ত্রণকারীর উপর আমন্ত্রিত মেহমানদের অনেক অধিকার রয়েছে কিন্তু মেহমানদেরও কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে। কুরআন করীমের সূরা আহযাবের আয়াতে আমাদের জন্য একটি আদেশ রয়েছে, যদিও এটি আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কিত উদ্ধৃতি কিন্তু মেহমানদের জন্যও একটি মৌলিক আদেশ। সাধারণভাবে যেটিকে প্রত্যেক মেহমানেরই মনে রাখা উচিত, সে যে কোন উদ্দেশ্যে যে কারো মেহমান হোন না কেন। কিন্তু জলসা সালানায় আগত মেহমানদেরকে এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখা উচিত। কেননা জলসায় আগত মেহমানরা এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আসেন, বিশেষ করে জামাআতী ব্যবস্থাপনায় অবস্থানকারী মেহমানগণ যেন এর প্রতি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেন। প্রথম কথা হচ্ছে দাওয়াত ব্যতীত মেহমান হইও না। এ বিষয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর উত্তম জীবনাদর্শ আমাদের সম্মুখে রয়েছে, তিনি (সা.)-এর সাথে এক দাওয়াতে, দাওয়াত প্রাপ্ত নির্ধারিত সংখ্যার বেশি লোক শামিল হয়ে রওয়ানা দিলেন। একজন বেশি ছিলেন, যিনি তাঁদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তিনি (সা.) কথা বলতে বলতে যে বাড়ীতে খাওয়ার দাওয়াত ছিল সেই বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন। তিনি (সা.) বাড়ির লোকদের কাছ থেকে এই বলে অনুমতি নিলেন যে, আমার সাথে অতিরিক্ত এক ব্যক্তি এসে গেছে, আপনি চাইলে সে বাড়িতে প্রবেশ করবে অন্যথায় বিনা লৌকিকতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও লজ্জা না করে বলে দিন আমি তাকে ফিরে যেতে বলে দিবো। কাজেই একটা কথা হচ্ছে, বাইরে থেকে জলসায় যারা এসেছেন তারা মনে রাখবেন, যদিও আপনারা আমন্ত্রিত হয়ে এসেছেন, আমন্ত্রণ ব্যতীত নয় কিন্তু একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, জামাআতের পক্ষ থেকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আতিথেয়তার ব্যবস্থা থাকবে, এরপর কিছু লোক জেদ করে অবস্থানের চেষ্টা করে। এ বিষয়টি তো তখন আমন্ত্রণহীন হাদীসে উল্লেখিত বিষয়টির মত হয় যা ফলশ্রুতিতে কষ্টদায়ক অবস্থার সৃষ্টি করে। কেউ কেউ সুদীর্ঘ সময় ব্যবধানের টিকিটের তারিখ নিয়ে আসে এরপর ওরা আপত্তি দেখাতে থাকে যে এখন কি করি আমি তো বাধ্য আর এই ফাঁকে কাজটাজও করে। তাই যদি বাধ্যবাধকতাই থাকে তবে যে অর্থ উপার্জন করছো সেখান থেকে খরচ কর, নিজের ব্যয়ভার নিজেই শামলাও, জামাআতের বোঝা হয়ো না। এত সুদীর্ঘ সময় অবস্থানকারীদের জন্য ব্যবস্থাপনায় সমস্যা সৃষ্টি হয়। গত বছরও হয়েছে এর পূর্ববর্তী বছরগুলো থেকেও হয়ে চলছে। তাদেরকে জায়গা খালি করে দিতে বললে এসব লোকের পক্ষ থেকে অভিযোগ উঠে। উপরন্তু আইনগত ভাবে কাজ করারও অনুমতি নেই। তারা যে ভিসা পায় তা ভিজিট ভিসা, এজন্যে কিছু জটিলতাও সৃষ্টি হয়। জামাআতের জন্য সমস্যা সৃষ্টি হয়। যদি প্রশাসনিক দপ্তরগুলোতে খবর হয়ে যায়, কারো সম্পর্কে তো খবর হয়েই যায়। এই জন্য সেই অল্প কিছু লোক, যারা এ ধরনের কার্যকলাপ করে থাকেন, আমি তাদেরকে বলছি, পরবর্তীতে যদি এভাবে থাকতে হয় তবে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করুন, জামাআতের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবেন না কেননা জলসার পর দীর্ঘ সময় অবস্থান করা তো ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হবে যারা দাওয়াত শেষ হওয়ার পরও বসে থেকে বাড়ির লোকদেরকে কষ্ট দেয় এবং তাদের জন্যে কষ্টের কারণ হয়।

অতঃপর আর একটি বিষয়ও মেহমানদের মনে রাখা উচিত যে, বিভিন্ন অবস্থানের লোক তাদের সেবার জন্য কর্মী হিসেবে আসেন, যাদের মধ্যে অনেকে উচ্চ শিক্ষিতও রয়েছেন, সাধারণ মানের শিক্ষিতও রয়েছেন এবং বিভিন্ন পেশার লোকও রয়েছেন। এঁরা সবাই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অতিথিদের সেবার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেন এবং স্ব-ইচ্ছায় ও উৎসাহের সাথে উৎসর্গ করেছেন। সাধারণত সকল কর্মীগণই খুব উৎসাহ নিয়ে এ কাজগুলো করছে এবং তারা সব ধরনের কাজ করার জন্য প্রস্তুত। জলসার পূর্বে আমিও ২/৩ বার মেহমানদের প্রতি সব দিকে থেকে খেয়াল রাখার ও তাদের সেবার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। এরপরও যদি কারো পক্ষ থেকে কিছুটা এদিক-সেদিক হয়ে যায় তবে মেহমানদেরও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া উচিত। প্রত্যেক মেহমান ও জলসায় অংশগ্রহণকারী সব লোক যদি নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়, তবে অল্প-

স্বল্প যে তিক্ততা সৃষ্টি হয় সেটিও আর হবে না।

গত বছর বৃষ্টির জন্য ব্যবস্থাপনায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই স্বল্পতার জন্য কিছুটা মন্দ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। এর জন্য ট্রান্সপোর্ট কর্মী ও মুসাফিরদের মাঝে ছোট ছোট কিছু তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল এবং এখনো আমার নিকট অভিযোগ রয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ কিছু মেহমান এমনও রয়েছেন যারা ছোট ছোট শহরে ও মহল্লায় তাদের গাড়ি দাঁড় করে রেখে আসেন। রাস্তার ওপর গাড়ি দাঁড় করে রাখা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও নিষেধ, প্রতিবেশীদেরও কষ্টের কারণ হয় আর M.T.A-তে বার বার কঠোরভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে এবং জামাআতগুলোকেও বলা হয়েছে কিন্তু তার পরও ইউরোপ থেকে আগত কিছু লোক তাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে ট্যাক্সীযোগে চলে আসে। এটা পুরোপুরি ভুল পদ্ধতি, যদি জলসায় বরকত থেকে লাভবান হওয়ার ইচ্ছায় এসে থাকেন তবে আইন মান্য করে চলুন,। কর্মীদের মাঝেও যখন কিছুটা তিক্ততা সৃষ্টি হয় তখন কর্মীরাও কতক সময় রাগান্বিত ও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাদেরকে মানুষ মনে করে তাদের ছোট ছোট ভুলগুলো উপেক্ষা করা শিখুন, তবে তিক্ততা বাড়ার সম্ভাবনা শুধু কমবেই না বরং এ অবস্থা সৃষ্টিই হবে না।

এরপর খাবারের সময় কখনো কখনো মহিলারা, শিশুরা অথবা এমন রোগীরা যাদের ডায়াবেটিসের মত রোগ রয়েছে, তারা ক্ষুধা সহ্য করতে পারেন না, অনেকক্ষণ খালি পেটে থাকলে তাদের কষ্ট হয়, তারা অনেকক্ষণ ক্ষুধার্ত থাকতে পারে না। কোন কারণে যদি অধিবেশন দীর্ঘ হয়ে যায় অথবা ট্রাফিক জ্যামে পড়ে দেরি হয়ে যায়, তবে এমতাবস্থায় যাদের কাছে শিশু রয়েছে এবং যারা রোগী এবং তাদের খাবার খাওয়ার প্রয়োজন পরে, যেভাবে আমি বলেছি। তাছাড়া আমি তো পূর্বেই এ সম্পর্কে কর্মীদেরকে বলেছি যে আপনারা এতটা কঠোর হবেন না, এমন লোকদের জন্য প্রোগ্রাম চলাকলিন সময়েও যদি প্রয়োজন পরে, তবে তাদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করুন, এতে করে কোন সমস্যা নেই, কেননা এ সময় দোকান-পাট বন্ধ থাকে। দ্বিতীয়ত: যাদের সাথে বাচ্চা রয়েছে ও অসুস্থ লোকদের মধ্যে থেকে যারা জলসায় আসেন তারা এমন হাঙ্গামী অবস্থাকে সামনে রেখে নিজেদের পকেটেও খাওয়ার মত কিছু রেখে দিন, যাতে যে কোন ধরনের তিক্ততা ও কষ্ট থেকে বাঁচতে পারেন।

এরপর ট্রান্সপোর্টের জন্য অপেক্ষাও করতে পারবেন, যদিও এবার গত বছরের তুলনায় ব্যবস্থাপনা অনেক ভাল, ইনশাআল্লাহ্ কষ্ট হবে না। কিন্তু এরপরও কোন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারি না। বিশেষ করে ফিরার সময় যখন ভীড় বেশি তখন কিছু কষ্টের পরিবেশ সৃষ্টি হয়, এ রকম হাংগামী অবস্থা সমাধানের জন্য ব্যবস্থাপকরা যেখানে যেখানেই বাসষ্ট্যান্ড স্থাপন করেছে অথবা যেখান থেকে যাত্রীদের উঠানোর ব্যবস্থা করেছে, সেখানে যাত্রীরাও নিজেদের কাছে কিছু রাখুন এবং যিয়াফত টিমেরও কাজ তাদের কাছে কিছু দিয়ে দেয়া, বিশেষ কিছু না হলেও পিঠা বা রুটির প্যাকেট কাছে রেখে দিন, দেরীর ফলে হাঙ্গামী অবস্থা সৃষ্টি হলে যাতে তাৎক্ষণিকভাবে খাবার হিসাবে কিছু না কিছু দেয়া যায়।

গত বছরও এ ধরনের কিছু কিছু অভিযোগ আসত। মেহমানদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, যারা আমন্ত্রক তারা তো তাদের দায়িত্ব পালন করবেনই কিন্তু সাথে সাথেই আমাদেরকেও তো আঁ হযরত (সা.) এর পবিত্র জীবনাদর্শের উপর চলা উচিত অথবা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে যে আদর্শ দেখিয়ে গেছেন সেভাবে চলা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি ধরনের মেহমান ছিলেন, তারও একটা উদাহরণ দেখে নিন, যা আমি একটি রেওয়ায়াত থেকে নিয়েছি। একজন আমন্ত্রক হিসেবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আদর্শ তো আমি গত খুতবায় উপস্থাপন করেছি কিন্তু দেখেন তিনি (আ.) যখন মেহমান হতেন, তখন কেমন মেহমান হতেন। হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব (রা.) লিখেছেন, জঙ্গে মুকাদ্দাসের *[একটি ধর্মীয় বিতর্ক অনুষ্ঠানকে জঙ্গে মুকাদ্দাস বলা হয়, যেটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও খৃষ্টানদের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এতে আব্দুল্লাহ্ আথম খৃষ্টানদের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। তিনি (আ.) সফরে ছিলেন এবং সেখানে মেহমান হয়েছিলেন]* অনুষ্ঠানে অনেক অতিথি একত্রিত হয়েছিলেন। একদিন বাড়ির লোকেরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জন্য খাবার রাখতে বা সঠিক সময়ে খাবার দেয়ার কথা ভুলে গিয়েছিল। তিনি (অর্থাৎ বর্ণনাকারী) বলেন, আমি আমার স্ত্রীকে তাগিদ দিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু সে অনেক কাজের ব্যস্ততায় ভুলে গিয়েছিল। এমনকি রাতের একটা বড় অংশ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর যখন খোঁজ নিলেন তখন সবার টনক নড়ল, দোকান পাটও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাই খাবারও পাওয়া গেল না। হুযূর (আ.)-কে অবস্থা বর্ণনা করা হল। তিনি (আ.) বললেন, এতটা ভীত হওয়ার বা লৌকিকতা দেখানোর কি দরকার, দস্তর খান (যে কাপড়ের উপর রেখে খাবার খাওয়া হয়)-এ দেখ, সেখানে বাড়তি কিছু পড়ে থাকতে পারে, সেটুকু আমার জন্য

যথেষ্ট। দস্তর খানে কয়েক টুকরা রুটি পাওয়া গেল। হুযূর (আ.) বললেন, এতটুকুই যথেষ্ট এবং সেখান থেকে দু-এক টুকরো খেয়ে নিলেন আর এতেই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

বর্ণনাকারী লিখেন, বাহ্যিকভাবে এ ঘটনাটিকে সাধারণ একটি ঘটনা মনে হবে, কিন্তু এর মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাদা-মাটা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের আশ্চর্যজনক এক চিত্র ফুটে উঠেছে, খাওয়ার জন্য ঐ সময় নতুন ভাবে আয়োজন করা যেত এবং এতে সবার ভালও লাগত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য সারা রাত জেগে থেকেও যদি রান্না করতে হতো তবুও এটি তেমন কোন কঠিন বিষয় ছিল না বরং ভালই লাগত কিন্তু অসময়ে কাউকে কষ্ট দেয়া হোক, তিনি (আ.) এটা পছন্দ করেননি, তিনি (আ.) এটারও পরওয়া করেননি যে, তাঁর জন্য উন্নত মানের খাবার আনা হয়নি, এবং এ অনীহা বা নিরুদ্বিগ্নতার জন্য কাউকে জবাবদিহিও করেননি আর অসন্তুষ্টির বহির্প্রকাশও করেননি বরং একান্ত সন্তুষ্ট ও হাস্য বদনে অন্যদের কুণ্ঠাবোধ দূর করে দিয়েছেন।

অতএব, কোন ভুলত্রুটি বা হাঙ্গামী অবস্থার কারণে কারো আতিথেয়তায় যদি কিছুটা ঘাটতিও পরে, তারপরও কেউ রাগান্বিত হওয়ার পরিবর্তে সর্বদা এটা স্মরণ রাখুন যে, আমাদের এখানে আসা কী উদ্দেশ্যে? শত শত, হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আসার পরও যদি এ উদ্দেশ্যকে খেয়াল না রাখেন, নিজেদের আধ্যাত্মিক, চারিত্রিক ও জ্ঞানগত অবস্থার উন্নতি সাধনের প্রতি মনোযোগী না হন তবে আপনি আপনার জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য পুর্ণ করতে পারেন নি।

গত ভ্রমণসূচীতে আমি যখন আফ্রিকা ভ্রমণ করেছি এটা তখনকার ঘটনা, আমি আমার এক খুতবায় এ ঘটনাটির উল্লেখ করেছিলাম যে, বেনীন থেকে এবং আইভোরিকোষ্ট হতে আগত কিছু লোক কয়েকটি কারণে এক বেলার খাবার পায়নি। কিন্তু তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে যখন ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে আর তাদের জন্য নতুন ভাবে ব্যবস্থা করার পর তারা বলেছে, দু:খ প্রকাশের কোন কারণ নেই। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, সে উদ্দেশ্য তো পূর্ণ হয়েছে, আমরা জলসায় অংশগ্রহণ করেছি, খলীফায়ে ওয়াক্তের উপস্থিতিতে জলসা হচ্ছে আর সেখানে আমরা উপস্থিত হতে পেরেছি। তো এরাই হচ্ছে সেই সব লোক যাদের সম্বন্ধে আমরা বলে থাকি, এরা (আফ্রিকাবাসী) নব আগমনকারী। এসব নব আগমনকারীরাই ঈমানের দিক থেকে উন্নতি করে যাচ্ছে। ছোট-খাট বিষয় নিয়ে অনেক সময় মহিলাদের পক্ষ থেকে বেশি অভিযোগ উঠে থাকে যেমনটা আমি পূর্বে বলেছি। সকল মেহমান স্মরণ রাখুন, সে পুরুষ হোন বা মহিলা, আমন্ত্রণকারীদের যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে তেমনি মেহমানরা শুধু অধিকারই রাখেনা বরং মেহমানদেরও অনুরূপভাবে কিছু দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে।

আঁ হযরত (সা.) তো মেহমানদেরকে তিনদিন পর্যন্ত আতিথেয়তা গ্রহণের অধিকার দিয়েছেন এরপর তো শেষ, পরবর্তীতে আমন্ত্রণকারী মেহমানের জন্য যা কিছু করে থাকে তা তো অনুগ্রহ। একজন আহমদী যখন মেহমান হিসেবে সালানা জলসায় যোগ দেয় তখন তাদের উদ্দেশ্য আতিথেয়তা গ্রহণ করা নয় বরং তাদের উদ্দেশ্য থাকে ঐসব পদ্ধতি ও রীতিনীতি শেখা, যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার হক আদায় করতে পারা যায় এবং যার মাধ্যমে তাঁর বান্দার হক আদায় করতে পারা যায়, এ বিষয়গুলোর জ্ঞান যদি পূর্ব থেকে থেকেও থাকে, শুধু জ্ঞান রাখলেই হক আদায়কারী হওয়া যায় না বরং জানার সাথে সাথে পালনও করতে হয়, কাজেই জলসার বরকত ও কল্যাণের মাধ্যমে এক্ষেত্রটিকে আরো উজ্জলতর ও জ্যোতির্ময় করতে পারেন। এ থেকেও অগ্রগামী হয়ে জামাতিভাবে দোয়ায় শামিল হয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক হারে আল্লাহ্ তাআলার ফযলের অধিকারী হতে পারেন।

সুতরাং এ দিনগুলোতে নামায ও দোয়ার প্রতি বিশেষভাবে মনযোগী হউন, নফল নামায আদায়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন। জলসার পরিবেশে এবং বাইরে আপনাদের নিজস্ব পরিবেশেও সালাম বিনিময়ের প্রচলন করুন। প্রেম, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পরিবেশ সৃষ্টি করুন, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে দোয়া করেছেন সেগুলোরও যেন অংশীদার হতে পারেন। একে পাওয়ার জন্য যারাই নেক নিয়্যতের সাথে প্রত্যাশা করবে এবং এর জন্য প্রচেষ্টা করবে, তবে সকল দেশের জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য যেভাবে এ দোয়াসমূহ সর্বদাই কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে অনুরূপভাবে এখানেও সমৃদ্ধি দান করবে।

আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে জামাআতের উন্নতির জামানত বা নিশ্চয়তা দান করেছেন তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বীয় জামাআতের জন্য যে সব দোয়া করেছেন সেগুলোর কবুলিয়্যতের জামানতও দান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এসব দোয়ার পিছনে তো ঐ সকল দোয়াও কাজ করছে বরং বলা উচিত, সেই দোয়াগুলোই কাজ করছে, যেগুলো আঁ হযরত (সা.) তাঁর উম্মতের ঐ সকল লোকদের জন্য করেছেন, যারা আঁ হযরত (সা.)-এর সত্যিকার প্রেমিকের

জামাআতে শামিল হয়েছে। সুতরাং ঐ সমস্ত দোয়ার অংশীদার হওয়ার বিষয়টি এখন আমাদের আমলের উপর নির্ভর করছে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফীক দান করুন।

আমি এখন ব্যবস্থাপকদের পক্ষ থেকেও কিছু বলতে চাই। সর্বপ্রথম এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের চার পাশের পরিবেশের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখুন, জলসায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে আর এ বছর তো বিশেষ অবস্থার জন্য পরিস্থিতি আরো অন্য রকম, তাই নিজের চার পাশে সজাগ দৃষ্টি রাখা খুব প্রয়োজনীয়। আপনারা যদি কোন অবাঞ্ছিত আগন্তুককে দেখতে পান তবে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে অবগত করুন। জলসাগাহে বসা অবস্থায় আপনাদের চার পাশে দৃষ্টি রাখুন, কেউ যদি তার কোন জিনিস রেখে উঠে যায়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে তার মনযোগ আকর্ষণ করুন। যদি কোন ব্যাগ বা খাম ইত্যাদি ও অন্য কোন জিনিস পড়ে থাকতে দেখেন তবে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থাপনা কমিটির লোকদের অবগত করুন। যারা নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন তারা এ বিষয়টির প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখুন, বিশেষ করে মহিলাদের জলসাগাহে তাদের তাঁবুতে অনেক বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার এবং গভীর দৃষ্টি রাখাও দরকার। কোন মহিলা যেন জলসা গাহে মুখ ঢেকে না রাখে।

যদি কেউ এভাবে বসে তখন নিরাপত্তাকর্মী ও পাশে বসা ব্যক্তির দায়িত্ব, তার মুখ দেখার ব্যবস্থা করা।

এরপর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন, আপনাদের কাছে ছাপা যে প্রোগ্রাম রয়েছে তাতে যেসব হেদায়াত বা দিক-নির্দেশনা রয়েছে সেগুলো গভীর মনোযোগের সাথে পড়ুন, এতে ঐ সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। সাধারণত উপদেশাবলীকে উপেক্ষা করা হয় আর এটাই সচরাচর হয়ে থাকে। আমরা যখন উড়োজাহাজে যাত্রা করি তখন দেখি, যাত্রাকালিন সময়ে বিভিন্ন (Announcement) ঘোষণা হয়। আর ঘোষণা সমূহে এমন দিক নির্দেশনা থাকে যে, যদি এমন হাঙ্গামী অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন এই এই করতে হবে। সাধারণত যারা বেশি বেশি ভ্রমণ করে তারা এটাকে একটা প্রথা মনে করে উপেক্ষা করে কিন্তু এগুলো গভীর মনোযোগের সাথে শোনা উচিত। আমি তো প্রতিবারই ভ্রমণের সময় মনোযোগের সাথে শুনে থাকি, প্রত্যেকবারই কোন না কোন কথা নতুন দৃষ্টি কোন থেকে সামনে আসে, বরং আমি তো এরপর তাদের কার্ডটিও পড়ে থাকি। কোন কোন যাত্রী হয়তো এজন্য শুনতে চান না যে, ভাবনার ফলে তারা শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করতে পারেন। এজন্য কল্পনা করার পরিবর্তে এবং ভীত হওয়ার পরিবর্তে, এ সব দিকনির্দেশনা শোনার পর নিজের জন্য এবং অন্য যাত্রীদের জন্য দোয়া করা উচিত আর একজন ভ্রমণকারীকে তো এমনিতেই দোয়া করতে থাকা উচিত, বরং এ অবস্থায় তো তারা দোয়া করার সুযোগ পান।

কিছুদিন পূর্বে আমার কয়েকজন আত্মীয় আমেরিকায় সমুদ্র ভ্রমণ গিয়েছিলেন। সেখানকার সমুদ্রে পাথর ও প্রচন্ড স্রোতও রয়েছে। ঐ সব দেশে হাঙ্গামী প্রয়োজনে তারা খুব ভালভাবে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। আমার এক আত্মীয়া আমাকে বলেছেন, তারা যখন দিক নির্দেশনা দিচ্ছিল তখন আমরা তা ভাসাভাসাভাবে শুনছিলাম, ঐ দিক নির্দেশের প্রতি ভালভাবে দৃষ্টি দেইনি পরে আমাদের নৌকা আকস্মিকভাবে দুর্ঘটনা কবলিত হয়ে উল্টে যায়। আল্লাহ্ তাআলার ফযলে কারো প্রাণহানি ঘটেনি। নৌকা উল্টে যাওয়ার পর পর প্রতিটি দিকনির্দেশনা স্মরণ হতে শুরু করে। তাদের দিকনির্দেশনা হতে যার যা মনে ছিল, সে সেই অনুযায়ী কাজ করা শুরু করে। কাজেই দিক নির্দেশনা উপকারের জন্যই দেয়া হয়ে থাকে, প্রতিটি পরিস্থিতিতেই যে সব দিকনির্দেশনা দেয়া হয় তা ঐ পরিস্থিতি হতে উপকৃত হওয়ার জন্যই দেয়া হয়ে থাকে, এ কারণে এগুলোকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। এটা মনে করা যে, আমরা তো প্রতি বছরই জলসায় এসে থাকি। তাই কেউ কেউ দিকনির্দেশনাসমূহকে ভাসাভাসা ভাবে দেখে থাকে, তারা ভাবে, আমরা তো গত ২৪/২৫ বছর বা শত বছর হতে এসব দিক নির্দেশনা শুনে আসছি, এখন শুনলেই কি আর না শুনলেই কি? পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, ধীরে ধীরে অসতর্কতার প্রবণতা সৃষ্টি হয় আর অসতর্কতার ফলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সুতরাং দিক নির্দেশনা, তা যেখানকারই হোক, সর্বদা মনোযোগের সাথে শোনা উচিত এবং সেগুলো পালনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সুতরাং এই মহতি জলসার দিকনির্দেশনা গুরুত্বের সাথে দেখুন, বিশেষ করে নিরাপত্তা, পরিচ্ছন্নতা, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা, সালামের প্রচলন করা এবং বাজামাত নামায আদায় করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হউন।

আল্লাহ্ তাআলা এই জলসায় যোগদান কারী প্রত্যেককে তার নিজ হেফাযতে রাখুন, এই যোগদান করা তাদের জন্য সবদিক থেকে কল্যাণের কারণ হউক, যেন দোয়া করার সুযোগ সৃষ্টি হতে থাকে। ব্যবস্থাপনা পরিষদের সাথেও সব ধরনের সহযোগিতার চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন।

অনুবাদ ঃ মুহাম্মদ আকরামুল ইসলাম

মুরব্বী সিলসিলাহ্

আমাদের সজাগ দৃষ্টি দেয়া উচিত
প্রতি বছরের আগত ঈদে আমরা কী করে আমাদের ঈমানের মান উন্নত করতে পারি
নিজেদের কুরবানীর মান কীরূপে বাড়াতে পারি
নইলে আমাদের এই গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই করায় আল্লাহ্ তাআলার কিছুই যায় আসে না

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

[সৈয়্যদেনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কর্তৃক ২০/১২/ ২০০৭ বায়তুল ফুতুহ লন্ডনে প্রদত্ত *ঈদুল আযহিয়ার খুতবা*

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٣٨﴾

(সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)

আমি যে আয়াত তেলাওয়াত করেছি, তাতে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন– আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত কখনও এর মাংস পৌঁছাবেনা? আর না রক্ত। বরং তোমাদের তাক্ওয়া তাঁর নিকট পৌঁছাবে। (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)

আজ আমরা ঈদুল আযহিয়া পালন করছি। যাকে কুরবানীর ঈদ বলা হয়। এই ঈদে যাদের সামর্থ্য রয়েছে তারা পশু কুরবানী করে। আর হাজীদের পক্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ পশু কুরবানী করা হয়ে থাকে। আজ ও আগামী কাল বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি পশু কুরবানী করা হবে। তবে এই ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু জবাই করাই কি ঈদের আসল উদ্দেশ্য? মসজিদে এসে দু রাকাত নামায পড়ে নিল। আর ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুতবা শুনে নিল। তারপর তাড়াহুড়া করে বাড়ি চলে গেল যেন পশু জবাই করতে পারে। অধিকাংশ দেশ, যেখানে প্রকাশ্য পশু জবাইয়ের অনুমতি রয়েছে সেখানে লোকেরা নিজেরাই পশু জবাই করে তবে ইউরোপে এর অনুমতি নেই। আর এমনটা করে তারা মনে করে আমরা খোদার সন্তুষ্টির জন্য যে কাজ করা প্রয়োজন তা করে ফেলেছি।

পাকিস্তানে আমি দেখেছি। ঈদের নামাযের ৫/৭ মিনিটের মধ্যেই ফেরার পথে দেখি, অনেক লোক ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেদের পশু জবাই করে কেটে বসে রয়েছে, সেখানে তো এখানকার মত বাধা-নিষেধ নেই। তদ্রূপ আফ্রিকার দেশগুলোতেও। যেখানে চাও পশু জবাই কর। কোন বাধা-নিষেধ নেই। রাস্তার পাশেই করা হোক না কেন? বরং আমি দেখেছি ঈদের নামায পড়ে যত তাড়াতাড়িই ফেরত আসা হোক না কেন রাস্তার পাশে বড় বড় পশু, যেমন গরু ও অন্যান্য পশু জবাই হতে দেখা যায়। অনেকে পশুর চামড়া ছিলিয়ে বসে থাকে। এমনকি মাংসও কাটা শুরু হয়ে যায়। এটা থেকে বুঝা যায়, এই লোকেরা যারা মাংস কাটার কাজে ব্যতিব্যস্ত তাদের মুসলমানই বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা মুসলমানই বটে। কেননা কুরবানীর পশুর মাংস মুসলমান ব্যতীত অন্যদের দ্বারা কাটানো হয় না। ওরা হয়তো বা নামাযই পড়েনি। নতুবা খুতবাও শুনেনি। তাদের শুধু পশু

জবাইয়েরই চিন্তা থাকে। কখন যাবো, আর কখন পশু জবাই করবো আর কখন মাংস খাব। তাদের ধ্যাণ-ধারনায় কেবল মাত্র ঐ চিন্তা থাকে, কিভাবে ঐ সুন্নতের ওপর আমল করবো। রসূল (সা.) ঈদের সময় অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিন সকালে পশু জবাই করে এর মাংস দিয়ে খেতেন। কিন্তু তারা এ বিষয়টি ভুলে যায় আঁ হযরত (সা.) সবচে বেশি এ ঈদের অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের নিগূঢ় তাৎপর্যকে বুঝতেন। আর নিজ উম্মতের মাঝেও এ শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করেছেন।

কুরবানীর ঈদের বিষয় শুধু এতটুকুই নয় যে পশু জবাই করো। আর নামাযের পর সর্বাগ্রে শুধু এ কাজই করো। ছাগল জবাই কর আর এর মাংস খাও। এই কুরবানীর ঈদের ক্ষেত্রে কুরবানীর (আত্মত্যাগের) এক দীর্ঘ ইতিহাস জড়িত রয়েছে। এর সূচনা হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর মাধ্যমে হয়েছে। আর এর সাথে তাঁর স্ত্রী সন্তানও শামিল ছিলেন। এতে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল (আ.)ও অংশগ্রহণ করেছেন। আর এর পরিপূর্ণতা আঁ হযরত (সা.) এর সত্তায় এসে রূপ লাভ করেছে। তাঁর (সা.) আদর্শের অনুসরণে তাঁর (সা.) সাহাবাগণও এর দৃষ্টান্ত জগতে স্থাপন করে গেছেন।

সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া উচিত, প্রতি বছর যে ঈদ আসে তাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার মানকে কীভাবে উন্নততর করতে পারি, নিজেদের কুরবানীর মানকে কিভাবে উন্নত করতে পারি নতুবা আমাদের এই গরু, ছাগল ইত্যাদি জবাই করাতে আল্লাহ্ তাআলার কিছুই যায় আসে না। আল্লাহ্ তাআলা যে উদ্দেশ্যের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সে উদ্দেশ্য পূরণকারী মানুষ তিনি দেখতে চান। নতুবা এই মাংস ইত্যাদি তো শুধুমাত্র জবাই করার একটা নিমিত্ত মাত্র। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেন,

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا

(সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)

স্মরণ রেখ! এই কুরবানীর (পশুর) রক্ত ও মাংস কখনো আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৌঁছে না। সুতরাং আমরা প্রতি বছর যে কুরবানী করি তাতে আসল কুরবানীর প্রেরণা থাকা উচিত। আর এটা কী? এর উত্তর আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে দিয়ে দিয়েছেন وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

(সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)

অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়ের তাক্ওয়া আল্লাহ্ তাআলার নিকট পৌঁছায়।

কুরবানীর এই দর্শনকে বর্ণনা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন– আল্লাহ্ তাআলা ইসলামী শরীয়তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধিবিধানের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। সুতরাং মানুষের জন্য এ নির্দেশ, তারা যেন নিজের সমস্ত শক্তি ও সত্তাকে খোদার রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়। বাহ্যিক কুরবানী এজন্যই। এটাই কুরবানীর আসল উদ্দেশ্য।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

(সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)

খোদার নিকট তোমাদের কুরবানীর রক্ত ও মাংস পৌঁছে না। পৌঁছে তোমাদের তাক্ওয়া। সুতরাং তাঁকে এতটা ভয় কর যেন তাঁর রাস্তায় মরেই যাচ্ছো। যেভাবে তুমি নিজ হাতে পশু জবাই কর, সেভাবেই তুমি খোদার রাস্তায় জবাই হয়ে যাও। যে তাক্ওয়ার মান ঐ স্তর থেকে নীচু রয়েছে সেটা অসম্পূর্ণ ও দুর্বল। অন্য জায়গায় বলেন–চিরাচরিত বিধান এটাই। সবকিছু মারেফাতে কামেলা (পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান) লাভের পর অর্জিত হয়। ভয়, ভালবাসা ও এর মূল মা'রেফাতে কামেলা। আল্লাহ্ তাআলার তাক্ওয়া অবলম্বন কর। সেটাকে বুঝবার চেষ্টা কর।

সুতরাং যাকে পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়েছে। তাকে পরিপূর্ণ ভালবাসাও দান করা হয়েছে। এটাই তাক্ওয়া। তাঁর ভয় ও ভালবাসা যেন থাকে। আর যাকে পরিপূর্ণ ভয় ও ভালবাসা দেয়া হয়েছে, সব গুনাহ থেকে তাকে পরিত্রাণ লাভের শক্তি দান করা হয়েছে। প্রত্যেক গুনাহ থেকে বাঁচার শক্তি তখনই লাভ হয় হৃদয়ে যখন পরিপূর্ণ ভয় থাকে। পরিপূর্ণ ভালবাসার সৃষ্টি হয়। আর পরিত্রাণ এরই মাধ্যমে লাভ হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমরা এ পরিত্রাণের জন্য না কোন রক্তের মুখাপেক্ষী, আর না কোন ক্রুশের মুখাপেক্ষী। আর না কোন প্রায়শ্চিত্তের আমাদের প্রয়োজন। বরং আমরা কেবল মাত্র এক কুরবানীর আকাঙ্ক্ষী যা নিজের আত্মার কুরবানী। যার প্রয়োজনীয়তাকে আমাদের হৃদয় অনুভব করছে। এমন কুরবানীরই আরেক নাম হলো ইসলাম। ইসলামের অর্থ হলো জবাই হওয়ার জন্য নিজ ঘাড়কে খোদার সামনে পেতে দেয়া। অর্থাৎ পরিপূর্ণ সম্মতির সাথে নিজের আত্মাকে খোদার সমীপে নিবেদন করা।

সুতরাং এটা হল ইসলাম। যে আদেশ আল্লাহ্ তাআলা দিয়েছেন তা পূর্ণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। আর এজন্য বড়-বড় সব কুরবানী দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

এদিকেই খোদা তাআলা কুরআন মজীদে ইঙ্গিত করে বলেছেন

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

(সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)

তোমাদের কুরবানীর রক্ত খোদার নিকট পৌঁছে না। আর মাংসও না। কেবল ঐ কুরবানী আমার নিকট পৌঁছে যে তোমরা আমাকে ভয় কর আর আমার তাক্ওয়া অবলম্বন কর। আমার আদেশ-নিষেধের উপর আমল কর।

সুতরাং বাহ্যিক কুরবানীর ব্যবস্থা এই সঞ্জীবনী শক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই করা হয়ে থাকে। নতুবা আমাদের পশু জবাই করা, এটা নেকি নয়। মাংস খাওয়াটাও নেকি নয়। আর না ঐ মাংস ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে।

সুতরাং আমাদেরকে বাহ্যিক কুরবানীর ক্ষেত্রে ঐ সঞ্জীবনী শক্তি সৃষ্টি করতে হবে যা করার নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে। আর এ পরিপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হযরত হাজেরা (রা.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) লাভ করেছিলেন বলেই তাঁরা কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরত হাজেরা (রা.) এর খোদা তাআলার সাথে এ সম্পর্কটা ছিল– ঈমান, ভালবাসা ও দৃঢ় বিশ্বাসের। যার কারণে তিনি হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে বলেছিলেন, যদি এটা খোদা তাআলার ইচ্ছা হয় তাহলে আমি আমার সন্তানসহ কুরবানী হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছি। খোদার নির্দেশের মোকাবেলায় আমাদের প্রাণের মূল্যই বা কি?

আর সেই পুত্রের তরবীয়তের মানদন্ড দেখুন! মা-বাপের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত অর্থাৎ খোদার প্রতি গভীর ভালবাসা দর্শন করে কেমন চারিত্রিক উৎকর্ষতা লাভ হয়েছিল। তাঁর এ ছেলে অনেক ছোট হওয়া সত্ত্বেও, তাক্ওয়া ও ভালবাসার গভীর ও গূঢ় তত্ত্ব না বুঝা সত্ত্বেও-এ ঘোষণা দিয়েছে

يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ۝

(সূরা সাফ্ফাত ঃ ১০৩)

হে আমার পিতা! তোমাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়ন কর। সুতরাং ঐ পিতা-মাতা ও সন্তানের কুরবানীর মানদন্ড ছিল এটা, যাঁদের স্মৃতির স্মরণে চিরকালের জন্য এ কুরবানীর রীতিকে প্রবাহমান করা হয়েছে।

এই কুরবানীকে সর্বকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়েছে, কেননা হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজের স্ত্রী-সন্তানকে জনমানবহীন এবং খাবার পানি শূন্য এক স্থানে বিসর্জন দিয়ে এমন এক কুরবানী করেছেন যেটা ঐ ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয়, যার নিকট আল্লাহ্‌র ভালবাসার বিপরীতে জগতের অন্য সব কিছুর ভালবাসা তুচ্ছ। বাহ্যিকভাবে তিনি দেখেছেন, তিনি নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে এক অনাবাদী জায়গায় ফেলে যাচ্ছেন যেখানে তারা জীবিত থাকতে পারবে না। কয়েকদিন পর তাদের মৃত্যুটা নিশ্চিত এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন। এজন্য আবেগের কারণে তিনি (আ.) হযরত হাজেরা (রা.) এর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারছিলেন না। শুধু মাত্র আঙ্গুল উঠিয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু হযরত হাজেরা ও ইসমাঈল (আ.) এর হৃদয় নবীর সান্নিধ্যের কারণে কুরবানীর জন্য যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন তারা সব ক্ষেত্রে ঘাড় সামনে পেতে দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেছেন এ রকম কুরবানীরই নাম অন্য শব্দে হলো ইসলাম। সুতরাং ঐ বংশের এটাই পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও কুরবানীর দৃষ্টান্ত ছিল। এটাকে আল্লাহ্ তাআলা গ্রহণ করেছেন। আর তাঁদেরকে সম্মানের আসনে সমাসীন করেছেন। আর এ কুরবানীকে আল্লাহ্ বিনা প্রতিদানে ছেড়ে দেন নি। শুধু মা ছেলেই নিরাপদ ছিলেন না বরং কিছুদিনের মধ্যে তাদের চারপাশে বসতি গড়ে উঠে। আর পরে বালির নিচে চাপা পড়া জগতের সবচে প্রাচীন গৃহকে ইব্রাহীম (আ.)-এর মাধমে বের করেন এবং দ্বিতীয়বার এটাকে নির্মাণ করান। হযরত ইব্রাহীম (আ.) যখন দ্বিতীয়বার আসেন তখন হযরত ইসমাঈল (আ.)ও এর নির্মাণের কাজ করেছিলেন আর সেই নির্মাণ কাজের সাথে সাথে দোয়াও করেছিলেন। খোদা তাআলা এটাকে গ্রহণ করো। এ কুরবানীকে গ্রহণ করো। আর এ দোয়াও করেছিলেন–এখন এ শহরকে আবাদ করো, এমনভাবে এ শহরকে আবাদ কর যেন এটা শান্তিকামী নিরাপদ শহর হয়। কোন ধরনের রক্তপাত যেন এতে না হয়। আর এখানে বসবাসকারীদের জন্য যেন সব সময় তোমার পক্ষ থেকে সব ধরণের ফলফ-লাদির রিয্ক পৌঁছতে থাকে। আর সবচে অগ্রগণ্য হয়ে এ দোয়া করছিলেন আমাদেরকে সর্বদা নেকীর ওপর প্রতিষ্ঠিত রেখ। আর তোমার সমীপে কুরবানী পেশকারীতে পরিণত কর। আর শুধু যেন এটা আমাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। এটা আমাদের সন্তানদের মাঝেও যেন প্রতিস্থাপিত হয়।

কুরআন করীমে এসেছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) এ দোয়া করেছিলেন-

رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۝

(সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! আমাদেরকে তোমার দু'জন নিষ্ঠাবান বান্দা বানাও। আর আমাদের বংশধরদের মাঝে তোমার নিষ্ঠাবান উম্মত সৃষ্টি করো। আর আমাদেরকে তোমার ইবাদত ও কুরবানীর পদ্ধতি

শিখাও। আর আমাদের ওপর তুমি সদয় দৃষ্টিপাত করো। নিশ্চয়ই তুমি সবচে বেশি সদয় দৃষ্টিপাতকারী। আর বার বার দয়াকারী।

সুতরাং এ দোয়া ছিল। আমাদেরকে সর্বদা এমন রাস্তায় পরিচালিত করো যা তোমার সন্তুষ্টির রাস্তা। যা পুত্র নির্জনে থেকে আর পিতা, সন্তান ও স্ত্রীকে নির্জনে রেখে কুরবানীর এমন এক দৃষ্টান্ত রেখেছেন যেটা আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছে–

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا (সূরা বাকারা ঃ ১২৫)

যখন তাঁর প্রভু ইব্রাহীমের পরীক্ষা নিলেন। তখন সে (ইব্রাহীম) সেগুলো পূর্ণ করলো। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাকে লোকদের জন্য ইমাম বানাবো।

তখনই তিনি নিবেদন করেছেন

وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
(সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

তুমি আমাদেরকে ইবাদত ও কুরবানীর পদ্ধতি শিখাও। আর আমাদের তওবা কবুল করে আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করো। আর কখনও যেন আমাদের দ্বারা এমন কাজ না হয় যার কারণে আমাদের কুরবানী নষ্ট হয়ে যায়। অবস্থার প্রেক্ষিতে তুমি সবচে ভাল জানো কোন্ সময় কোন্ কুরবানী করা প্রয়োজন। সুতরাং তোমার পথ প্রদর্শন ও তোমার সন্তুষ্টিই মূল বিষয়। এটা থেকে কখনও আমাদেরকে বাহিরে নিক্ষেপ করো না। এটা ছিল তাদের দোয়া।

আরো এক দোয়া তিনি যাচনা করেছেন যাতে কিয়ামত পর্যন্ত আগত মানব প্রজন্মের জন্য নিজের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন এক নবীর আবির্ভাবের জন্য দোয়া করেছেন যিনি হযরত ইব্রাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর চেয়ে বড় কুরবানী সম্পাদনের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হবেন। আর এটা এ দোয়া ছিল

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ
إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(সূরা বাকারা ঃ ১৩০)

হে আমাদের প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাদের মধ্যে এমন এক রসূলকে প্রেরণ কর যে তাদের নিকট তোমার আয়াত পড়ে শুনাবে। যে তাদেরকে কিতাবের শিক্ষা দিবে। হিকমত শিখাবে আর তাদের পুতপবিত্র করবে। নিশ্চয়ই তুমি পরম ক্ষমাশীল ও পরম প্রজ্ঞাময়।

আল্লাহ্ তাআলা পিতা-পুত্রের এ দোয়া কবুল করে আঁ হযরত (সা.)কে বলেন– তুমি ঘোষণা করে দাও, আমি ঐ রসূল যাঁর দোয়া হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) করেছিলেন। আর পুনরায় আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সা.) কে বলেন–হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এ দোয়া করেছিলেন– وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا
(সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

কিন্তু হে মুহাম্মদ (সা.)! তুমি জগতে ঘোষণা দাও আমার মাঝে সমস্ত ইবাদত ও কুরবানীর রীতিনীতি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। আমি ঐ পরিপূর্ণ ও পূর্ণমানব এবং রসূল যার মধ্যে মানবীয় সব গুণাবলীর চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এখন নতুন কোন রাস্তা শিখার প্রয়োজন নেই। আমি খোদার সমীপে এমনভাবে সমর্পিত যে আমার নিজের বলতে কিছুই নেই। সব কিছু খোদার। আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে এ ঘোষণার স্বীকৃতিও দিয়েছেন "কুল ইন্নাস সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ ইয়া ইয়ামামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন–তুমি বলে দাও আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার সমস্ত চেষ্টা প্রচেষ্টা ও সাধনা আল্লাহ্র জন্য। আমার জীবিত থাকা, মৃত্যুবরণ করা সবই আল্লাহ্র জন্য। তিনিই একমাত্র খোদা যিনি সমস্ত বিশ্ব জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তাঁর কোন শরীক নেই। আর আমাকে ঐ বিষয়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমি সর্ব প্রথম আত্মসমর্পণকারী। অর্থাৎ জগতের সূচনা থেকে এর পরিসমাপ্তি পর্যন্ত আমার মত আর কোন পূর্ণমানব নেই। এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আর কেউ নেই। এমন ফানাফিল্লাহ্ (আল্লাহ্তে নিবেদিত) আর কেউ নেই।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এ দোয়া করেছিলেন

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً
مُّسْلِمَةً لَّكَ (সূরা বাকারা ঃ ১২৯)

হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে দু'জন আত্মসমর্পনকারী বানাও। আরও দোয়া করেছেন رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
(সূরা বাকারা ঃ ১৩০)

হে আমাদের প্রভু! তুমি তাদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে রসূল পাঠাও। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা এ দোয়া কবুল করে আঁ হযরত (সা.) কে প্রেরণ করেছেন। আর তাঁকে প্রেরণের পর এ ঘোষণা দিয়েছেন–আমি তোমার কুরবানীকে ও তোমার দোয়াকে গ্রহণ করেছি। আর এ মহান রসূল এ ঘোষণাও দিয়েছেন। শুধু তাঁর ইবাদত আর কুরবানীই ঐ মর্যাদা লাভ করেনি–বরং এটা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্যও এমন এক আদর্শ যার গন্ডির বাহিরের কোন কুরবানীকে কুরবানী বলা হয় না, কোন ইবাদতকে ইবাদত বলা যায় না। এর পর এ ঘোষণাও দিয়েছেন, আমি সর্ব প্রথম মুসলমান। আমি সর্বপ্রথম নিষ্ঠাবান। আর এ মর্যাদা আমার পূর্বে কেউ লাভ করেনি, আমার যুগেও লাভ করেনি আর

আমার পরেও কেউ লাভ করবে না। আর এটাই তাঁর (সা.) পরিপূর্ণ মানব ও খাতামুল আম্বিয়া হওয়ার আসল রহস্য। সমগ্র জগতের সমস্ত মানুষ ও সমস্ত নবী এ ঘোষণায় অন্তর্ভুক্ত। কেউ-ই এই মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না।

এ মর্যাদা যা তাঁকে আল্লাহ্ তাআলা দান করেছিলেন এটা শুধু তাঁর নিজের সত্তার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং উম্মতকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন এ মহান রসূল তোমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। এ জন্য এ রসূলের আনুগত্যের দাবী করলে ঐ পথে চল যাতে চলার জন্য তিনি দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন–রসূল (সা.) কে বলা হয়েছে, হে নবী! যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে বলে দাও–আমার নামায, আমার কুরবানী আল্লাহ্র জন্য। আমার জীবিত থাকা, আমার মৃত্যুবরণ করা সবই আল্লাহ্র জন্য। যারা আমার অনুসারী হতে চায় তারা যেন আমার পুরোপুরি অনুসরণ করে। আর দেখুন! সাহাবীরা তাঁর অনুসরণ করে কিরূপ দৃষ্টান্ত জগতে উপস্থাপন করে গেছেন। তারা কুরবানীর এমন দৃষ্টান্ত আরবের স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক সমাজে রেখেছেন যে, নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার নাম-নিশানা অবশিষ্ট রাখেননি। নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান সাব্যস্ত করে নিজ প্রভুর সমীপে সর্বস্ব কুরবানী পেশ করেছেন। যেটা এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। ইবাদতের এমন মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন যার দৃষ্টান্ত না আগে পাওয়া যেত, না পরে পাওয়া যাবে। যে দৃষ্টান্ত আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণ অর্থাৎ পুরুষ, মহিলা, শিশু নির্বিশেষে সবাই রেখে গেছেন সেটা আমাদের জন্য একটা উপমা। তারা তাদের রাতগুলোকে ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত করেছেন। কুরবানীর প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েছেন। ইবাদত করা শুরু করেছেন তো সারারাত ইবাদত করেছেন। আর এমন এমন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন যাতে ঘুম দূর হয়ে যায়। মোট কথা, কুরবানীর উন্নত থেকে উন্নততর দৃষ্টান্ত তারা স্থাপন করে গেছেন। যেগুলো আমাদের জন্য আদর্শ।

জীবন কুরবানীর একটা উদাহরণ দিচ্ছি–হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ এর ঘটনা। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় আসলো তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তার অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কেউ জিজ্ঞেস করলো–মৃত্যুকে ভয় করছো? অথবা কি অন্য কোন দুশ্চিন্তা? আপনি ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের অনেক সেবা করেছেন। আপনার ভয় কিসের? আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে অবশ্য প্রতিদান দিবেন। তিনি বল্লেন–মৃত্যুর ভয় নেই। এজন্য আমি কাঁদছিও না। ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়ার জন্য আমি বিপদ থেকে বিপদসঙ্কুল সব জায়গায় শত্রুর মোকাবেলা করেছি। তুমি আমার পা থেকে কাপড় উঠিয়ে দেখ, আমার বাহু থেকে কাপড় উঠিয়ে দেখ, আমার পিঠ থেকে কাপড় উঠিয়ে দেখ, আমার বুক থেকে কাপড় উঠিয়ে দেখ, আমার সমস্ত শরীরকে দেখে নাও। এমন কোন জায়গা নেই যেখানে আঘাতের চিহ্ন নেই। আমি তো আল্লাহ্র রাস্তায়, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য প্রাণ কুরবানী দেবার আশায় ভয়ংকর সব জায়গায় গিয়ে যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আজ আমি এজন্য কাঁদছি যে বিছানায় আমার মৃত্যু হচ্ছে। আল্লাহ্ করুন আমার শহীদের মর্যাদা অর্জিত না হওয়ার জন্য তিনি যেন আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হন।

এটা ছিল ঐ মনি মানিক্য ও হীরা যা মহা নবী (সা.) নিজের পবিত্রকরণ শক্তি দ্বারা নিজের অনুসারীদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন। সারা জীবন যারা লাগাতার কুরবানী দিয়ে গেছেন তারা খোদা তাআলার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলাও সন্তুষ্ট। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা **'রাযিয়াল্লাহু আনহুম'** শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তারপরও তাদের এ ভয় কাজ করছে হয়তো আমাদের কুরবানী কবুল হয়নি।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) নিজের বংশধরদের মাঝে সর্বদা যেন নিষ্ঠাবান উম্মত সৃষ্টি হয় এজন্য দোয়া করেছিলেন। আর এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা আঁ হযরত (সা.) কে পাঠিয়ে, তাঁকে (সা.) খাতামুল আম্বিয়া বানিয়ে, তাঁর শরীয়তকে পরিপূর্ণতা দান করে কিয়ামত কাল পর্যন্ত জারি রাখার ব্যবস্থা করেছেন। এজন্য মৃতকে জীবিত করার দৃষ্টান্ত, প্রকৃত কুরবানী করার দৃষ্টান্ত আঁ হযরত (সা.) কে মান্যকারীদের মধ্যেই বিদ্যমান থাকার কথা ছিল। যেভাবে আমি আমার খুতবায় বর্ণনা করেছি–হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে মৃত জীবিত করার যে দৃশ্য দেখানো হয়েছে–অর্থাৎ চতুর্থ পাখিকে পোষ মানানোর যে ঘটনা দেখানো হয়েছে এটা আঁ হযরত (সা.) এর গোলামে সাদেক ও মসীহ্র মাধ্যমে মৃত জীবিত হওয়ার ঘটনাকে দেখানো হয়েছে। কেননা তিনি হচ্ছেন মসীহ্ ও মাহদী যিনি তাঁর নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক ও অনুসরণকারী। যিনি তাঁর নেতার আদর্শের ওপর চলে নিজের ইবাদত, নিজের কুরবানী, নিজের জীবন মরণ সবই খোদার জন্য একনিষ্ঠ করে দিয়েছেন। আর নিজের জামাআতের মাঝে এ আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। আর এজন্য অনবরত চেষ্টা করে গেছেন।

সুতরাং আজ আমাদের কুরবানীর ঈদ তখনই প্রকৃত ঈদ হবে যখন আমরা কেবল নিজেদের কুরবানীর পশু আর ঈদের আনন্দের দিকে দৃষ্টি দেব না। বরং নিজের আত্মাকে কুরবানী করে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টাকারী হবো। খোদা তাআলার বিধানাবলীর ওপর পুরোপুরি আমলকারী হবো। নিজের

কুরবানীর মানকে বৃদ্ধি করতে থাকবো। ঐ কুরবানীকে জীবিত রাখবো যা এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মান্যকারীরা করেছেন। তারা নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। কিন্তু নিজের ঈমানের ওপর কোন আঁচড় লাগতে দেননি।

সুতরাং আজ আমরা যেখানে ঈদের খুশি আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যেই পালন করছি, সেখানে ঐ শহীদদেরকে ও তাদের সন্তানদেরকে দোয়ায় স্মরণ রাখা উচিত যারা আহমদীয়াত অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তারা কুরবানীর বিষয়কে বুঝেছেন আর এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত হয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সন্তানদের প্রতি করুণা করুন, অনুগ্রহরাজী বর্ষণ করুন। তাদের দ্বীন ও দুনিয়া দুটিই কল্যাণমন্ডিত করুন।

আমাদেরকে সর্বদা আমাদের ঐ অঙ্গীকার স্মরণ রাখতে হবে যে আমরা আমাদের জান, মাল, সম্মান সব কিছু কুরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকবো। এজন্য আমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত।

ইন্দোনেশীয়ার এক স্থানে ইদানিং কঠোর বিরোধিতা হচ্ছে। আমাদের কয়েকটি মসজিদ ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে, ক্ষতি করা হয়েছে। দু'দিন পূর্বে দুটি মসজিদের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। পুলিশ আমাদের কিছু মসজিদ সিল করে দিয়েছে। এ ছাড়া আহমদীদের বাড়িঘরে আক্রমণ করা হয়েছে। কয়েক জন আহমদীকে আহত করা হয়েছে। গতদিনও একজনকে আহত করা হয়েছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন।

ওই দূর দূরান্তের লোকেরাও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)কে মান্য করেছেন। তাঁর মসীহ্ ও মাহদীর দাবিকে গ্রহণ করছেন। এর ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। ঈমানকে শক্তিশালী রেখেছেন। নিজের ঈমানের ওপর আত্মীয়তা, ভয় ও লোভ লালসাকে প্রাধান্য দেননি। সেখানে অধিকাংশই গরীব লোক। কষ্টে দিনাতিপাত করেন। কিন্তু আল্লাহ্র ফযলে ঈমানে এত অগ্রসর ও শক্তিশালী যে দৈহিক ক্ষতি ও মৃত্যুকে বরণ করার জন্য তারা প্রস্তুত। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষতি ও মৃত্যুকে তারা কিছুতেই গ্রহণ করছেন না। সুতরাং এটাই মৃতকে জীবিত করা। যা আঁ হযরত (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা এ যুগে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দেয়ারও প্রয়োজন হয়। আর সারা দুনিয়াতে আহমদীরা এর জন্য প্রস্তুত। আর এটাই মৃতকে জীবিত করার জলজ্যান্ত প্রমাণ। একই উদ্দেশ্যে–আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য পাকিস্তানী আহমদীরা কুরবানী দিচ্ছে। ইন্দোনেশীয় আহমদীরা কুরবানী দিচ্ছে, আর বাংলাদেশী আহমদীরা কুরবানী দিচ্ছে, শ্রীলংকার আহমদীরা কুরবানী দিচ্ছে। ভারতের আহমদীরা কুরবানী দিচ্ছে, বরং আজকাল তো ইউরোপের কিছু দেশেও আহমদীদের অবস্থা খারাপ করা হচ্ছে। সুতরাং এ সমস্ত অবস্থাকে সামনে রেখে আমাদের মাঝে সর্বদা ঐ আদর্শকে উজ্জীবিত রাখতে হবে– পরিপূর্ণ আনুগত্যের সাথে আমরা আল্লাহ্ তাআলার পূর্ণ নিষ্ঠাবান বান্দা হওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তাআলা পূর্ণ নিষ্ঠাবান হওয়ার তৌফিক দান করুন। তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম ও ভালবাসা দান করে আমাদের হৃদয়কে আলোকিত করুন। আমাদের থেকে সব ধরণের অন্ধকার সর্বদা দূর হতে থাকুক। তাঁর নূর সবর্দা আমাদের ওপর প্রকাশিত হতে থাকুক যাতে আমরা কুরবানীর আসল প্রেরণাকে বুঝতে সক্ষম হই।

এখন ইনশাআল্লাহ্ তাআলা খুতবার পর দোয়া হবে। দোয়াতে শহীদদেরকে স্মরণ রাখবেন। জামাআতের জন্য যারা কুরবানী দিয়েছেন, তাদের সন্তানদেরকেও স্মরণ রাখবেন। 'আসীরান' – আহমদীয়াতের জন্য যারা কোন না কোন ভাবে গ্রেফতার হয়েছেন তাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। আহমদীয়াতের সংবাদ পৌঁছানোর কাজে যারা সাহায্য করে যাচ্ছেন, দাওয়াতে ইলাল্লাহ্র কাজে রত তাদেরকেও স্মরণ রাখবেন। নিজেদের সময় আল্লাহ্র দ্বীনের জন্য যারা ব্যয় করে যাচ্ছেন, মালী কুরবানীকারীদেরকেও দোয়ায় স্মরণ রাখবেন। সমস্ত আহমদী, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রয়েছেন তাদের সবাইকে স্মরণ রাখবেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে নিজ রহমতের চাদরে আবৃত রাখুন। মুসলমান দেশসমূহের যে অবস্থা তারা একে অন্যকে মারছে, হত্যা করছে। তাদের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে শুভবুদ্ধি দিন। প্রকৃত ইসলামকে তারা বুঝতে সক্ষম হোক। পাকিস্তানের অবস্থা, আরব দেশের অবস্থা, ইরাকের অবস্থা, আফগানিস্তানের অবস্থা, ফিলিস্তিনের অবস্থা খুবই খারাপ। তাদের জন্য দোয়া করুন–আল্লাহ্ তাদের অবস্থা ভাল করে দিন। তাদেরকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শে গড়ে উঠার তৌফিক দিন। মসীহ্ ও মাহদীকে মান্যকারী বানান। এভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জন্যও দোয়া করুন। দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার সম্পর্ক রয়েছে আঁ হযরত (সা.) এর সত্তার সাথে, আর তাঁর (সা.) সত্যিকার প্রেমিকের বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাঝে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সবাইকে এ তৌফিক দিন যেন তারা এ নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে সক্ষম হয়। এখন দোয়া করবো। কিন্তু দোয়ার পূর্বে আমি আপনাদেরকে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। সবার জন্য আল্লাহ্ তাআলা সব দিক থেকে ঈদকে মোবারকমন্ডিত করুন আর পৃথিবীতে বসবাসকারী সব আহমদীকেই ঈদ মোবারক। পাকিস্তানী, ইন্দোনেশীয়, শ্রীলংকান, বাংলাদেশী, ভারতীয়, আফ্রিকান ও ইউরোপে বসবাসকারী সব আহমদীর জন্য ঈদ মোবারক। ঈদ সবার জন্য অফুরন্ত রহমত ও কল্যাণের কারণ হোক। *(ভিডিও থেকে শ্রুত)*

অনুবাদ ঃ

মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

মুরব্বী সিলসিলাহ্

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের খিলাফত শতবার্ষিকী ইজতেমা উপলক্ষে আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর আশীসপূর্ণ বাণী

লন্ডন
৩১ অক্টোবর, ২০০৮

মোহতারাম সদর সাহেব
মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ।

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশ মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ৩১তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আপনাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতার গভীর চেতনা ও প্রেরণা নিয়ে জামাআত এ বছর আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্তি উদযাপন করছে, সে দৃষ্টিকোন থেকে এ বছর অনুষ্ঠিত প্রতিটি অনুষ্ঠানের রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। এ বছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যত অনুষ্ঠান হচ্ছে খিলাফতের কল্যাণস্বরূপ তা অভূতপূর্ব সফলতা বয়ে আনছে। বাংলাদেশের মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র এ ইজতেমাও খিলাফত শতবার্ষিকী ইজতেমা, তাই এ ইজতেমাকে সফল করার জন্য সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

কৃপালু খোদার এক মহান নিয়ামত হলো খিলাফত, তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মানার কল্যাণে আমাদেরকে এই অমূল্য সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন। আমি বিশ্বের প্রত্যেক আহমদীর মাঝে খিলাফতের প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততা দেখছি তা অসাধারণ। দোয়া করি খোদা তাআলা বাংলাদেশ জামাআতের প্রত্যেক সদস্য বিশেষভাবে আনসার ভাইদেরকে এই চেতনায় দৃঢ়তর ও অধিক সমৃদ্ধ করুন। খিলাফত শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে যেসব দোয়া ও নফল ইবাদতে অভ্যস্ত হয়েছেন তা আপনাদের জীবনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হোক। খিলাফতের নেতৃত্বে জামাতের উন্নতি দেখে সত্যের শত্রুরা বিভিন্ন অপচেষ্টা ও হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, তাই জামাআতের নিরাপত্তার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) -এর ইলহামী দোয়া **রাব্বি কুল্লিশাইন খাদিমুকা রাব্বি ফাহ্ ফাযনি ওয়াল সুরনি ওয়ারহামনি** বেশী বেশী পাঠ করতে থাকুন। নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে খিলাফতের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করুন কেননা, এতেই আমাদের মুক্তি নিহিত।

ঐতিহাসিক পরম্পরায় আমরা আনসারদের আরও একটি উপাধি দেখতে পাই আর তা হলো 'হাওয়ারী'। হাওয়ারীরা চরম পরিস্থিতির মুখেও খোদার খাতিরে হযরত ঈসা (আ.)-এর পাশে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার করেছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা যে, আনসারে আহমদীয়াতও এক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে নেই।

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র সকল সদস্য নিজ পরিবারবর্গকে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বস্তুনিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। সকল আহমদী গৃহে প্রত্যেহ কুরআন মজীদের তেলাওয়াতকে সুনিশ্চিত করা আনসারুল্লাহ্‌র মৌলিক দায়িত্ব। বর্তমান বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের বাণী পৌঁছে দেয়া আমাদের কর্তব্য। মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র ইজতেমায় অংশগ্রহণকারীদের মাধ্যমে আমার এই পয়গাম বাংলাদেশের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিন।

আল্লাহ্ তাআলা এই ইজতেমাকে সার্বিকভাবে সফল করুন। ইজতেমায় যোগদানকারী প্রত্যেক সদস্যের ওপর খোদা তাআলার অশেষ রহমত বর্ষিত হোক। আপনাদের ইজতেমায় যোগদানের মূল উদ্দেশ্য যেন খোদার সন্তুষ্টি হয়ে থাকে। এ ইজতেমা যেন কোন ক্রমেই প্রথাগত অনুষ্ঠানে রূপ না নেয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। মহান আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সমস্ত নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং আপনাদের ওপর অনন্ত আশিস বর্ষণ করুন। তিনি আপনাদের ধন-সম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দিন এবং সবাইকে নিষ্ঠার সাথে জামাআতের খিদমত করার তৌফিক দান করুন, আমীন!

ওয়াস্‌সালাম

মির্যা মাসরূর আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস

প্রাচ্যই হোক বা পাশ্চাত্য
প্রতিটি দেশই হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস সালাম-এর সত্যতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছে

ভাষান্তর : মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্

২৭ জুলাই ২০০৮ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) যুক্তরাজ্য জামাআতের জুবিলী জলসায় সমাপণী ভাষণ দান করেন। সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর (আই.) **'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রাসূলী ইন্নাল্লাহা ক্বাবীউন আ'যীয'** (আল মুজাদিলা ঃ ২২) পাঠ করার পর বলেন, এ আয়াতটি কুরআন করীমেরও আয়াত আবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতিও কয়েকবার ইলহাম হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এটা প্রথমবার ইলহাম হয় ১৮৮৩ সালে। নিশ্চয়তা দানকারী এ ইলহাম হওয়ার মাঝে শুভ সংবাদ ছিল যে, অবশ্যই তাঁর (অর্থাৎ মসীহ্ মাওউদ আ. এর) বিজয় লাভ হবে। জগৎ সাধ্যে যতটা কুলায় চেষ্টা চালিয়ে দেখুক খোদার কথা পুরা হয়েই ছাড়বে। এখন আঁ হযরত (সা.) এর জ্যোতির্ময় আলোকমালা ও কল্যাণরাজি তাঁর (সা.) **'সত্যিকারের এই গোলাম'** গোলামে সাদেক এর মাধ্যমে অর্জিত হবে। ব্যাপকভাবে দুরূদ শরীফ পাঠ করার কারণে তাঁর (আ.) এই সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং বলেছেন–এ সবকিছুই সেই মহান রসূল নবী করীম (সা.) এর পূর্ণ আনুগত্যের ফল, যাঁকে খোদা তাআলা সর্বপ্রকার পুরস্কারে ভূষিত করেছেন, আর তাঁরই (সা.) মাধ্যমে সমস্ত ঐশী আলোকমালা লাভ হয়ে থাকে। এই আলোকমালা ওই সব লোকদের অর্জিত হয় যারা ঈমানের উচ্চস্তরে উপনীত হন আর তাদের ঈমান থাকে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ।

হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ,) এর জামাআতের অবশ্য কর্তব্য যে, সারা দুনিয়ায় তারা আঁ হযরত (সা.) এর বাণী পৌঁছাতে থাকবে। তিনি (আই.) বলেন, খোদা সত্যই যাদের ভালবাসেন তাদের সাহায্য সমর্থন দান করতে থাকেন আর অকাট্য নিদর্শন প্রদর্শন করার মধ্য দিয়ে তাদের সত্যতা প্রকাশ করে দেন। শত্রুরা চায় এরা ধ্বংস হয়ে যাক, কিন্তু খোদা তাদেরকেই জয়যুক্ত করতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর জীবন এ কথার সাক্ষী। তাঁর (আ.) বিরুদ্ধে যে-ই দাঁড়িয়েছে তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে। সে মুসলিমই হোক কিংবা অমুসলিম–লেখরাম, আব্দুল্লাহ্ আথম, পাদ্রী পিগট–এরা সবাই নিদর্শন হয়ে গিয়েছে।

ইংল্যান্ডের পাদ্রী পিগট প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পিগটের মিথ্যা 'কিশতিয়ে নূহ' ধ্বংস হয়ে গিয়েছে অপরপক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আসল **'কিশতিয়ে নূহ'** সফলতা লাভ করেছে। সে কথার বিশদ বিবরণ সে কালের সংবাদ পত্রে প্রকাশিতও হয়েছে।

আমেরিকার ড. আলেকজান্ডার ডুই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন–সেই ব্যক্তি বলেছিল, 'আমি দোয়া করছি ইসলাম দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাক'। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, 'এসো! মোকাবিলা করি। সত্যবাদীর জীবদ্দশায় মিথ্যাবাদী মারা যাক'। প্রথমদিকে সে এর কোন উত্তর দিল না পরবর্তীতে সে তার নিজস্ব পত্রিকা Leaves of Healing-এ ১৯০৩ সালে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দেয়া মুবাহেলার আহ্বান গ্রহণ করে নিল। ১৯০৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী তিনি (আ.) জানিয়ে দেন, অতি নিকটবর্তী সময়ে খোদা তাআলা বিজয়ের মহান নিদর্শন দেখাতে যাচ্ছেন। সে অনুযায়ী ৯ মার্চ ১৯০৭ সালে সে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ল আর এভাবে ইসলামের সত্যতার নিদর্শন প্রকাশ করে গেল। তার এই মৃত্যুতে এক পত্রিকা লিখলো– *'স্বকপোলকল্পিত নবী অপঘাতে দুর্বিষহ একাকীত্বে মৃত্যুবরণ করলো, অন্যদেরকে অলৌকিক আরোগ্যদানের দাবীদার নিজেই অপঘাতে মারা গেল'*। Bolton Herald পত্রিকায় GREAT IS MIRZA GHULAM AHMAD শীর্ষক এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয় আর এভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ ইলহাম **'গোলাম আহমদ কী জয়'** (বিজয় গোলাম আহমদের) অত্যন্ত মর্যাদার সাথে পূর্ণতা লাভ করে। হুযূর (আই.) বলেন, **প্রাচ্যই হোক বা পাশ্চাত্য, প্রতিটি দেশই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সত্যতার নিদর্শন**

প্রত্যক্ষ করেছে। তাঁর (আ.) পরলোক গমণের পর তাঁর খলীফাগণ এমনকি তাঁর অনুগত দাসদের দ্বারাও নিদর্শন প্রদর্শিত হয়ে চলছে। আহমদীয়া সিলসিলাহ্ ঘানা-র মুবাল্লেগ মাওলানা নযীর আহমদ মুবাশ্বের সাহেবের উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন– লোকেরা আহমদীয়াতের সত্যতার নিদর্শনের প্রার্থী হলো। তিনি দোয়া করলেন আর সেই দোয়ার ফলে ভূমিকম্প এলো। সারাদেশে রব উঠলো–'আহমদীয়াত সত্য' এভাবে বহু লোক জামাআতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

আহমদীয়া খিলাফত প্রসঙ্গে হুযূর (আই.) বলেন, আহমদীয়া খিলাফতের প্রতিটি পদক্ষেপে নিদর্শন প্রকাশিত হয়ে চলছে। ১৯৭৯ সালে ভূট্টোর নিদর্শন, ১৯৮৮তে জিয়াউল হকের নিদর্শন সমগ্র বিশ্ব দেখেছে। হুযূর (আই.) আরও বলেন, **'আহমদীয়া খিলাফত' প্রতিষ্ঠিত থাকা নিজ থেকেই এক মহান নিদর্শন।** আমরা নিজেরা আর অন্যেরা–সবাই এ নিদর্শনটি প্রত্যক্ষ করে চলছে। **খোদা তাআলা এক শ' বছর ধরে আহমদীয়া খিলাফতকে কেবল প্রতিষ্ঠিতই রাখেননি বরং একে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করেছেন,** প্রতিটি সংকট কালে খোদা স্বয়ং আহমদীয়া খিলাফতকে সুরক্ষা দান করেছেন। এথেকে সাব্যস্ত হয় যে খোদা তাআলা এই জামাআতের সাথে রয়েছেন। **সব অ-আহমদীদের চিন্তিত হওয়া উচিত –'তারা সত্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন না তো'!** আহমদীয়া খিলাফত সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজ পুস্তিকা 'আল ওসীয়্যত'-এ বলেছেন, আমি চলে গেলে পর খোদা তোমাদের জন্য 'দ্বিতীয় কুদরত' পাঠাবেন যা সর্বদা তোমাদের সাথে থাকবে। আর বিগত এক শতাব্দী ধরে ঐশী এ প্রতিশ্রুতি বড় উজ্জ্বলাকারে পূর্ণ হয়ে চলছে।

সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন ব্যক্তিদের দেখা স্বপ্নের কথা উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, সাধু প্রকৃতির বহু লোককে স্বপ্নের মাধ্যমে খোদা তাআলা জানিয়েছেন যে, এ-ই সত্য মসীহ্, আমার সাহায্য সমর্থন এরই সাথে রয়েছে, আর আমার প্রেরীত ইসলামের পাহলোয়ানও সে-ই। প্রসঙ্গক্রমে একজন আহমদী ব্যক্তির ভ্রান্ত এক ধারণার উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, আহমদী এক ব্যক্তি ধারণা থেকে বলেছে, খিলাফত সম্পর্কিত হাদীসে 'সুম্মা সাকাতা' শব্দাবলী উল্লেখিত রয়েছে আর এ কথায় বর্ণিত হয় না যে খিলাফত চিরস্থায়ী। হুযূর (আই.) বলেন, এ বিশ্লেষণ হযরত মসীহ্ মাউদ (আ.) এর বর্ণনার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ কারণে এমন ব্যক্তিদের নিজদের সংশোধন করা উচিত নচেৎ নিজ ঈমানের ব্যাপারে শঙ্কিত হোন।

হুযূর (আই.) বলেন, যেসব ব্যক্তিগণ ইবাদত পালনে খোদাভীতির (তাক্ওয়ার) পথে চলে জীবন অতিবাহিত করবেন, তারাই সফলতা লাভ করবেন। 'আয়াত ইস্তেখলাফ' প্রসঙ্গ উল্লেখ করে হুযূর (আই.) বলেন, এ আয়াতে **'ইয়া'বুদুনানী লা ইউশরিকুনা বী শায়আন'**–এর মধ্যে শির্ক থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে আর প্রত্যেক প্রকার শির্ক থেকে কেবল তখনই পবিত্র থাকতে সক্ষম হওয়া যায় যদি আল্লাহ্ তাআলার যিক্র (স্মরণ ও নাম যপ) করতে থাকা হয় আর তাঁর ইবাদতকারী হওয়া যায়।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, প্রত্যেক আহমদীর এ কথার প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, খোদা তাআলা নিজ প্রিয়দের সাথে কথা বলেন। এই কারণে তারও উচিত আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়তে প্রচেষ্টা চালানো। এজন্য আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি বিপুল হারে দুরূদ প্রেরণ করুন। দুরূদ শরীফ ছাড়া খোদা তাআলার সাথে সম্পর্ক হতে পারে না। সে কারণেই নামাযে দুরূদ শরীফ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, কবুলিয়্যত (গ্রহণযোগ্যতা) লাভ করবার তিনটি উপায় বা মাধ্যম রয়েছে–প্রথমত রসূল (সা.) এর আনুগত্য, দ্বিতীয় দুরূদ শরীফ আর তৃতীয়ত ঐশী প্রেম। আঁ হযরত (সা.) এর আবির্ভাবের পর খোদার প্রতি ভালবাসার দাবী মিথ্যা হয়ে যায় যদি নবী (সা.) এর আনুগত্য করা না হয়। খোদা তাআলার সান্নিধ্য পেতে মাধ্যম বা যোজনাকারীর আবশ্যকতা রয়েছে আর সে মাধ্যম হলো আঁ হযরত (সা.) এর ভালবাসা আর তাঁর (সা.) ভালবাসা লাভের উপায় হচ্ছে তাঁর প্রতি আধিক্যের সাথে দুরূদ প্রেরণ করা।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, **আহমদীয়া খিলাফতের শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ায় আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি অধিক হারে দুরূদ প্রেরণের কাজ নিঃশেষ হয়ে যায় নাই বরং নব শতাব্দী আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এজন্য দুরূদ শরীফ আগের চেয়ে আরও বেশি করে প্রেরণ করতে থাকুন।** প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে আঁ হযরত (সা.) এর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া আমাদের কর্তব্য। প্রত্যেককে আঁ হযরত (সা.) এর পতাকাতলে সমবেত করার দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তানো হয়েছে। এজন্য গত ২৭ মে' এর দিনে সমগ্র জামাআত থেকে অঙ্গীকারও নেয়া

হয়েছে। সে অঙ্গীকার পালনের জন্য দোয়াও করুন আর বিশেষ প্রচেষ্টা চালান। **আঁ হযরত (সা.) কে বিশ্ব মানবতার ত্রাণ কর্তা সাব্যস্ত করে গোটা দুনিয়াকে দুরূদ প্রেরণকারী বানাতে হবে আমাদের, যাতে সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ্ তাআলার কৃপা লাভের ভাগীদারে পরিণত হয়।** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর এক ঘটনা বর্ণনা করে হুযূর (আই.) বলেন, একবার বিপুল সংখ্যায় 'দুরূদ শরীফ' প্রেরণের ফলে সারারাত ধরে ফিরিশ্‌তারা 'নূর' এর মশক নিয়ে পালাক্রমে আসতে থাকলো।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, জগৎকে একনিষ্ঠ ইবাদতকারী আর তাঁর (সা.) প্রতি দুরূদ প্রেরণকারী বানানোতেই আঁ হযরত (সা.)-এর বিজয় সাফল্য নিহিত।

হুঁযূর (আই.) বলেন, দুরূদ শরীফের বাক্যাংশ **'সাল্লি'**-তে কৃপা দানের কথা উল্লেখিত রয়েছে। **'বারিক'**-এ এই ধারাবাহিকতা চলমান থাকা এবং এর প্রবৃদ্ধি ঘটতে থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। **'সাল্লি'** বীজের ন্যায় আর **বারিক** হচ্ছে ঐ বীজকে প্রবৃদ্ধি দান করার জন্য দোয়া। দোয়ার সাথে দুরূদ শরীফ প্রেরণে রত থেকে পূর্বের চেয়ে আরও বেশী করে আঁ হযরত (সা.) এর বাণী ছড়িয়ে দেয়া-সর্বত্র পৌঁছাতে থাকা আমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। এমনটা করলে আমরা আগের চেয়ে বেশী সফলতা লাভে সক্ষম হবো। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সন্তানেরা তৌহীদ প্রতিষ্ঠায় যতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন আমাদেরকে তার চেয়েও অগ্রগামী হয়ে কুরবানী পেশ করতে হবে। কেননা আঁ হযরত (সা.) এর শুভ সংবাদ গোটা বিশ্বের জন্য। হযরত ইবরাহীম (আ.) কিতাবধারী এক নবীর আবির্ভাবের জন্য দোয়া করেছিলেন আর সে অনুযায়ী আঁ হযরত (সা.) শুভাগমণ করলেন। তাঁর কর্মক্ষেত্র সমগ্র জগতব্যাপী তাই বর্তমানে সফলতার চাবিকাঠি তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনার ওপরই নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনের আয়াত **'রাযীতু লাকুমুল ইসলামা দীনা'** (আল মায়েদা ৪) অনুযায়ী সারা জগতের সফলতা ওই নবী (সা.) এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার মাঝে নিহিত। এই শুভ বার্তা বয়ে নিয়ে সারা পৃথিবীতে আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে। আমাদের কর্তব্য যে নিজ মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে গোটা বিশ্বে প্রকৃত ইসলামকে তুলে ধরতে হবে। আমাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রয়েছে আরও রয়েছে তাঁর (আ.) কৃত দোয়াসমূহ। প্রত্যেক দেশের বাসিন্দারা অঙ্গীকার করুন যে, তাদের সারা দুনিয়াকে ইসলাম দ্বারা আলোকোজ্জ্বল করতে হবে। আপনারাই হলেন তারা, যাদেরকে সারা বিশ্বে পবিত্র কুরআন করীমের শিক্ষামালার বিস্তৃতি ঘটাতে হবে। আপনারাই হচ্ছেন তারা, যাদেরকে সমগ্র পৃথিবীময় তৌহীদের ঝান্ডা-একত্ববাদের পতাকা গেঁথে দিতে হবে। আমরা এ মহৎ কর্ম সাধন না করলে অন্য লোকেরা সেই কর্ম সম্পাদন করবে। এমন না হয় যে, আমরা বঞ্চিত থেকে যাই। তাই নিজেদের ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করুন। আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি দুরূদ প্রেরণ করুন আর গোটা বিশ্বে ইসলামের বাণী প্রচার করুন। আমাদের সফলতা লাভের উপায় এটাই আর এরই দ্বারা আমরা জগতকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাক্ষীদাতা বানাতে সক্ষম হবো। আল্লাহ্ তাআলা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস পোষণ করুন। তিনি-খোদা, স্বয়ং স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সব বিরুদ্ধবাদীদের নিস্ফল করে দেবেন। এটা শত বর্ষের নয় বরং আদিকাল থেকে দেয়া আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সেই সামর্থ্য দান করুন। আমীন!

ঈমান উদ্দীপক হৃদয়গ্রাহী এক দৃশ্য ঃ

জলসাগাহে ৮৬টি দেশ থেকে আগত ৪০,৬৬৫ জন আশেকে রসূল (সা.) এর এই সমাবেশ হুযূর (আই.) এর সারগর্ভ ও ঈমান উদ্দীপক ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে ইসলামের সপক্ষে সোচ্চার **'নারা'** দিতে শুরু করে। সেই ক্ষণে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য ফুটে ওঠে। তা হলো এই-

সমাবেশ স্থলের সবাই উচ্ছলতায় মুহ্যমান ছিলো আর তাদের সোচ্চার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস যখন মুখরিত হয়ে উঠছিল তেমনি সে ক্ষণে হুযূর (আই.) এর মুখ থেকে **'খামোশ'** (চুপ করো) শব্দ উচ্চারিত হলো। মাত্র একটি শব্দে ধ্বনিত হুযূর (আই.) এর নির্দেশ জনবহুল জলসাগাহকে পিনপতন নীরবতায় ঢেকে দিল।

এভাবে আরও একবার জামাআতের সদস্য বৃন্দ সাব্যস্ত করে দিল যে তারা আহমদীয়া খিলাফতের সাথে নিবীড় প্রেমময় সম্পর্ক রাখে, নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় আর আনুগত্যের সুগভীরে প্রোথিত তাদের এ সম্পর্ক। আর তাদের আধ্যাত্মিক সম্পর্কের এ বাঁধন অটুট ও চির অম্লান।

এ দৃশ্য অবলোকন করে বহু অ-আহমদী দর্শকবৃন্দ অকপটে এ স্বীকারোক্তি প্রদান করে যে, বিভিন্ন দেশ, বর্ণ গোত্র ও গোষ্ঠী থেকে আগত জনবহুল এক বিরাট সমাবেশে ঘটে যাওয়া অভাবনীয় এ দৃশ্য এই প্রথমবার তারা দেখলো। **আলহামদুলিল্লাহ্ !**

(তথ্য সূত্র ঃ আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৩ অক্টোবর ২০০৮)

প্রসঙ্গ ঃ কুরবানী

কুরআন করীমে কুরবানীর পটভূমি ঃ

আলহাজ্জ মোহাম্মাদ মুতিউর রহমান

"এরপর সেই পুত্র (অর্থাৎ ইসমাঈল) যখন তার সাথে দৌড়াবার বয়সে উপনীত হলো তখন সে (অর্থাৎ ইবরাহীম) বললো, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি যেন তোমাকে জবাই করছি। অতএব তুমি চিন্তা কর, 'তোমার কি অভিমত?'সে বলল, 'হে আমার পিতা! তুমি যে আদেশ পেয়েছ, তা-ই কর,ইনশাআল্লাহ্ তুমি আমাকে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের মাঝে (দেখতে) পাবে।'

এরপর তারা যখন উভয়েই (আল্লাহ্র সমীপে) আত্মসমর্পণ করলো এবং সে তাকে জবাই করার জন্যে কপালের ওপর উপুড় করে শোয়ালো, তখন আমরা তাকে ডাক দিলাম, 'হে ইবরাহীম! তুমি তোমার স্বপ্নকে অবশ্যই পূর্ণ করেছো।' আমরা এরূপেই সৎকর্মশীলদের পুরস্কার দিয়ে থাকি

নিশ্চয় এটা ছিল এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

আর আমরা এক মহান কুরবানীর দ্বারা এ ফিদিয়া (মুক্তিপণ) দিয়েছিলাম।

আর আমরা পরবর্তীগণের মাঝে তাকে (সুখ্যাতিতে) প্রতিষ্ঠিত করলাম।

ইবরাহীমের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক!

এরূপেই আমরা সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার দিয়ে থাকি। নিশ্চয় সে আমাদের মু'মিন বান্দাদের একজন ছিল।" (সূরা সাফ্ফাত ঃ ১০৩-১১২)।

কুরবানী সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হেওয়া সাল্লামের হাদীস :

হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গরু সাতজনের পক্ষ থেকে এবং উট ৭ জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী) করা যেতে পারে (মুসলিম ও আবূ দাউদ)।

হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশক যখন আসে আর তোমাদের কেউ কুরবানী করার ইচ্ছা রাখে সে যেন নিজের কেশ ও চর্মের কোন কিছু স্পর্শ না করে (অর্থাৎ না কাটে)। অপর বর্ণনায় আছে সে যেন কেশ না ছাঁটে এবং কোন নখ না কাটে। আরেক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ দেখবে এবং কুরবানীর ইচ্ছা রাখবে সে যেন নিজের চুল ও নিজের নখগুলোর কিছু না কাটে (মুসলিম)।

হযরত আলী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শিং ভাঙ্গা ও কান কাটা পশু দিয়ে আমাদেরকে কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন (ইবনে মাজাহ্)।

বনী সুলাইম গোত্রীয় সাহাবী হযরত মুজাশে' (রা:) হতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলতেন, ছয় মাস বয়সের ভেড়া এক বছর বয়সের ছাগলের স্থান পূর্ণ করে (আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ্)।

ফিকাহ্ আহমদীয়ার প্রতি এক নজর

"সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী সুন্নতে মুয়াকিদা ও ওয়াজিব (ইবনে মাজাহ্, পৃষ্ঠা ২২৬, তিরমিযী আবওয়াবুল আযহিয়া পৃষ্ঠা ১৮১)। এতে একটি হিকমত ও প্রজ্ঞা এই, কুরবানী দাতা ইঙ্গিতের ভাষায় একথা স্বীকার করে, যেভাবে এ নিম্নস্তরের পশুটি আমার জন্যে উৎসর্গীকৃত হচ্ছে সেভাবে উচ্চ স্তরের সত্তার উদ্দেশ্যে আমার জীবনকে উৎসর্গ করতে হলে আমি সন্তুষ্টচিত্তে উৎসর্গ করবো। মোট কথা কুরবানী একটি প্রতীকী ভাষা। এর তাৎপর্য হলো এই, যিনি পশু জবাই করেন তিনি নিজের সত্তাকে কুরবানী করার জন্যে প্রস্তুত আছেন।

কুরবানীর জন্যে উট, গরু, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা থেকে যে কোন হালাল পশু জবাই করা যেতে পারে। উট ও গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে এবং ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে দেয়া যথেষ্ট। আর মানুষ কুরবানী করার নিয়্যত ও উদ্দেশ্যে নিজ পরিবারকেও অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

কমপক্ষে উট ৩ বছরের, গরু ২ বছরের, ভেড়া ছাগল প্রভৃতি এক বছর বয়সের হতে হবে। দুম্বা যদি মোটা তাজা হয় তাহলে ৬ মাসের বয়সের হলেও কুরবানী বৈধ হবে। কুরবানীর পশু দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত হওয়া উচিত নয়। লেংড়া, কান কাটা, শিং ভাঙ্গা এবং অন্ধ পশু কুরবানী করা বৈধ নয়। এভাবে রুগ্ন জীর্ণ শীর্ণ পশুকেও কুরবানী করা বৈধ নয়।

কুরবানীর সময় হলো ১০ই যিলহাজ্জ ঈদের নামাযের পর থেকে আরম্ভ করে ১২ই যিলহাজ্জ সূর্য ডুবার আগ পর্যন্ত। কুবানীর মাংস সদকা নয়। অতএব কুরবানীদাতা এ মাংস নিজেও খেতে পারেন এবং আত্মীয়স্বজনও খেতে পারেন। এথেকে গরীবদের অংশ দেয়া উচিত। তিন ভাগ করাই উত্তম। এক ভাগ নিজেদের এক ভাগ আত্মীয় স্বজনের এবং এক ভাগ গরীবদের মাঝে বন্টন করা হয়" (ফিকাহ্ আহমদীয়া থেকে পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৩)।

কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য

আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৪ হাজার বছর আগের কথা। আল্লাহ্র এক নবী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। অতি বৃদ্ধ বয়সে জন্ম নিয়েছে একটি ছেলে। এ ছেলে আল্লাহ্র মহাদান। তাই খুবই আদরের। নাম তার ইসমাঈল। তিনি যখন তাঁর পিতার সাথে কাজকর্ম করার বয়সে উপনীত হলেন তখন আল্লাহ্র আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)-কে জবাই করতে উদ্যত হলেন। একথা আমরা প্রবন্ধের প্রথমে উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত থেকে

জানতে পারি। আল্লাহ্ তাঁকে (আ.) ডেকে বললেন, হে ইব্রাহীম! তুমি তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছো। তিনি ছেলেকে জবাই করলেন না অথচ কিভাবে স্বপ্ন বাস্তবায়িত করলেন এ বিষয়ে আমাদের ভেবে দেখার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

প্রথম কথা হলো, ধর্মের নামে নরবলি দেয়ার প্রথা বহু আগে থেকে চলে আসছিল। আল্লাহ্ তাআলা রক্ত- পিপাসু নন যে তাঁর প্রিয় সৃষ্টির রক্তে তিনি তুষ্ট হবেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বপ্নের নিজ ব্যাখ্যানুযায়ী সন্তান কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা নরবলি প্রথাকে চিরতরে রহিত করার জন্য এ জবাই হতে দিলেন না। পরে ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্র আদেশে পশু জবাই করলেন। নরবলির কুপ্রথা পশু বলিতে রূপান্তরিত হলো।

দ্বিতীয়ত হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর এক-অদ্বিতীয় (বাইবেলে আছে, হযরত ইবরাহীম তাঁর এক- অদ্বিতীয় পুত্র ইসহাককে কুরবানী করছিলেন। হযরত ইসমাঈল প্রথম সন্তান তাই যতদিন ইসহাক জন্মগ্রহণ করেন নি হযরত ইসমাঈলই এক-অদ্বিতীয় সন্তান ছিলেন এবং ইসমাঈলকেই কুরবানী করা হয়েছিল। এখানে বাইবেল ভুল শিক্ষা দিচ্ছে) পুত্র ইসমাইলকে শিশু বয়সেই আল্লাহ্ তাআলার আদেশে মক্কার নিভৃত অরণ্যে তাঁর মাতা হযরত হাযেরা সহ পরিত্যাগ করে এসেছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে সেখানে আল্লাহ্র পবিত্র ও প্রাচীন কা'বা ঘরের সংস্কার হলো এবং মক্কা নগরী প্রতিষ্ঠিত হলো। আর সেখানে হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশে আবির্ভূত হলেন বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতাবা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম। এ মহান পরিকল্পনাকে দৃষ্টিপটে রেখে মহান আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ মহান কুরবানীকে দুনিয়ার সামনে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ্ তাআলা স্বপ্নে এ আদেশ দিলেন আর অমনি হযরত ইবরাহীম (আ.) **আসলামতুলি রাব্বিল আলামীন** বলে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। মহান কুরবানীর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর সৃষ্টি হলো দুনিয়াতে। পিতামাতা কর্তৃক অতি আদরের দুলাল দুলালীকে খোদার পথে উৎসর্গ করে দেয়ার প্রথা চালু হলো। এরই অনুকরণে আজ আমরা দেখি আহমদীয়া জামাআতে ওয়াকফে জিন্দেগী ও ওয়াকেফীনে নও স্কীমের অধীনে সন্তানদের কুরবানী করতে। এ কুরবানী মরার উদ্দেশ্যে নয় বরং একটি জাতি গোষ্ঠীকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর এ কুরবানীর আত্মা এবং শক্তি নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলয়হে ওয়া সাল্লাম তাঁর (সা.) উম্মতকে পশু কুরবানীর আদেশ দিলেন। তাই বিশ্বের প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলমান প্রত্যেক বছর ১০ই যিলহাজ্জ তারিখে কুরবানী করে থাকে। হযরত ইসমাঈল (আ.) যেভাবে পিতার ছুরির নিচে মাথা পেতে দিয়েছিলেন, কুরবানীর পশু যেভাবে ছুরির নিচে মাথা পেতে দেয় তেমনই প্রত্যেক মুসলমানের এ প্রতিজ্ঞা হওয়া আবশ্যক যেন ধর্মের খাতিরে ইসলামের পথে তারা নিজেদের এ ভাবে কুরবানী করে দিতে পারে। আবার কুরবানীর পশুর মত নিজেদের পশুত্বকে বলি দেয়ার শিক্ষাও আমরা কুরবানী থেকে পেয়ে থাকি। কেবল গোশ্ত খাওয়াই এ কুরবানীর উদ্দেশ্য নয়। আর এতে আল্লাহ্রও কোন উপকার নেই। আল্লাহ্ স্বয়ং বলেছেন-**লা ইয়ানা লাল্লাহা লুহুমুহা ওয়া লা দিআউহা ওয়া লাকিইঁয়ানালাহু তাক্ওয়া মিনহুম** অর্থাৎ ওগুলোর মাংস বা ওদের রক্ত কখনো আল্লাহ্র কাছে পৌছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের পক্ষ থেকে তাক্ওয়া পৌছে (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮)। সুতরাং ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নত অনুযায়ী নবী করীম (সা.)-এর নির্দেশে কুরবানী পালনের মাধ্যমে প্রতি বছর মুসলিম নিজের মাঝে তাক্ওয়াকে আর একবার ঝালিয়ে নেন যেন প্রয়োজনের দিনে আল্লাহ্র পথে কুরবানীর পশুর ন্যায় নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন।

প্রসঙ্গত কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্য না বুঝার কারণে কেউ কেউ কটূক্তি করে থাকেন। তাদের দৃষ্টিতে কুরবানী একদিকে যেমন অপচয় অর্থাৎ একদিনে সারা বিশ্বে লক্ষ লক্ষ পশু জবাই করে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিনের ঘাটতি সৃষ্টি করা হচ্ছে অন্যদিকে একটা অবোধ পশুকে আল্লাহ্র নামে নৃশংসভাবে হত্যা (!) করার ফলে আর একজনের পুণ্যের হাড়ি ভরতি হচ্ছে।

আপাত দৃষ্টিতে উপরোক্ত উক্তি সঠিক বলে মনে হলেও গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলে এটা বোকার উক্তি বলে প্রতীয়মান হবে। আমাদের মনে রাখা দরকার, আল্লাহ্ তাআলা যেসব বস্তু হালাল (বৈধ) করেছেন এর মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে বরকত ও প্রবৃদ্ধি রেখে দিয়েছেন। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই গরু ছাগল প্রভৃতির বাচ্চা উৎপাদনের হার কুকুর শূকর ইত্যদির চেয়ে কম-বারেও আর সংখ্যায়ও। কুরবানী এবং মাংস নিষেধ দিবস (Meat less day) ছাড়াও প্রতিদিন বিশ্বে লক্ষ লক্ষ গরু ছাগল ইত্যাদি জবাই হচ্ছে। তবুও আমরা দেখতে পাই পশু পালকের পশু-পাল নিঃশেষ হয় না। অথচ বহুগুণে কুকুর শূকর পয়দা হলেও (মুসলমানের জন্যে এগুলো যদিও নিষিদ্ধ) এদের সংখ্যা তুলনামূলক কমই দেখা যায়। রাস্তা ঘাট তো কুকুর শূকর প্রভৃতিতে ভরতি থাকার কথা। যেভাবে গরু ছাগল প্রভৃতি খাওয়া হয় আল্লাহ্ যদি এগুলোতে বরকত না দিতেন তাহলে এ প্রজাতিগুলো বহু আগেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিত কেননা খাবার জন্য এদের সংকট দেখা দিত।

প্রকৃতির দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই 'বড়'র বাঁচার জন্যে 'ছোট' সব সময় প্রাণ দিচ্ছে। ছোট মাছ বড় মাছের জন্যে জীবন দিচ্ছে। বাঘ, সিংহ প্রভৃতি

পশু ছোট ছোট নিরীহ প্রাণী খেয়ে বেঁচে আছে। যারা অতি দরদ দেখিয়ে গরু ছাগল জবাই করার ব্যাপারে কটূক্তি করেন তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয়, জীব হত্যা করতে পারবেন না, একথা পালন করলে তারা কি বাঁচবেন? বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, গাছ লতা-পাতা এদের সবার প্রাণ আছে। এদের ওপর আমরা সবাই নির্ভরশীল। তাদের সার্থে অসংখ্য জীবাণু আত্মবলি দিচ্ছে। এ কি তাদের জানা আছে। প্রকৃত কথা এই, ক্ষুদ্র'র আত্মত্যাগের মাধ্যমেই বৃহৎ-এর জীবন' আর এর মাঝেই ক্ষুদ্রের জীবনের সার্থকতা রেখে দিয়েছেন আল্লাহ্ তাআলা।

মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার সেবায় জীব-জন্তু বৃক্ষ তরুলতা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু নিয়োজিত এদের কুরবানীতে মানব জীবন বাঁচে এবং এদের জীবন হয় সার্থক। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ এদের সৃষ্টি করেছেন। তবে এদের প্রতি আমাদের যে কর্তব্য রয়েছে আমরা তা যেন ভুলে না যাই। অতএব প্রকৃতির মাঝে কুরবানী ও ত্যাগের মহিমাই যে প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ ভাবেই আল্লাহ্ প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন।

কুরআন হাদীস এবং বুযুর্গানে দ্বীনের ভাষ্য থেকে যতটুকু জানা যায় কুরবানীর পেছনে যে উদ্দেশ্যটি কাজ করা আবশ্যক তা হলো তাক্ওয়া বা খোদার সন্তুষ্টি। হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর একমাত্র পুত্র হযরত ইসমাঈল (আ.)-কে খোদার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যে কুরবানীর পেছনে এ উদ্দেশ্য ও আত্মা কাজ করে না সে কুরবানী, কুরবানীর আওতায় পড়ে না। আমরা অনেক সময় দেখি নাম ফলানোর জন্যে বা লোক দেখানো ভাব নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক ভাবে কুরবানী করা হয়। উদ্দেশ্য থাকে গরুর একটা 'রান' অমুক বেয়াইর বাড়ীতে, অমুকটা অমুক সাহেবকে দিতে হবে ইত্যাদি। আমরা অনেক সময় দেখেছি সেই 'রান'টা খুব সাজিয়ে ঢোল বাদ্য সহকারে যথাস্থানে পাঠানো হয়। এটা ঢাকার পয়সাওয়ালা লোকদের মাঝেই বেশি দেখা যায়। আল্লাহ্র কাছে এ কতটা গ্রহণীয় তা তিনিই ভাল জানেন।

সামর্থ্য ও বিত্তবানরাই কুরবানী দিয়ে থাকেন। লক্ষ্য থাকে যেন ফ্রিজ ভরে রাখতে পারেন এবং অনেক দিন ধরে কুরবানীর মাংস খেতে পারেন। এমনও বলতে শুনা গেছে, এতে নাকি সওয়াব বেশি। গরীবদের ২/১ টুকরা দিয়ে ফ্রিজ ভরে রাখার প্রবণতা গৃহীণিদেরই একটু বেশি। কিন্তু এটা উচিত নয়। যে গরীব জনগোষ্ঠী সারা বছর তেমন মাংস খেতে পারে না সেই দরিদ্র গোষ্ঠী কুরবানীর সময় একটু বেশি করে মাংস খেয়ে সারা বছরের প্রোটিনের অভাব কিছুটা হলেও পুষিয়ে নিতে পারবে কুরবানীর এটা একটি বড় উদ্দেশ্য। সামর্থ্যবানগণ তো প্রত্যেক দিনই মাংস খেয়ে থাকেন। কুরবানীর মাংসের মূল্য সাধারণ সময়ের মূল্যের চেয়ে বেশ একটু বেশিই হয়ে থাকে। সুতরাং বেশি দামের মাংস দিয়ে ফ্রিজ ভরতি না করে আগে কম দামের মাংস দিয়ে ফ্রিজ ভরতি করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি? আর গরীবদের একটু মাংস বেশি দিয়ে পুণ্যের খাতায় পুণ্য বেশি লেখানো কি বোকামীর কাজ হবে?

মাংস বন্টনের ব্যাপারে জামাআতে আহমদীয়াতে সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে। কেননা, এখানে রয়েছে খিলাফতের নেযাম। যারা কুরবানী করেন তারা এক তৃতীয়াংশ মাংস জামাআতের ব্যবস্থাপনার কাছে জমা করে দেন। যারা কুরবানী দিতে পারেন না জামাআত আগেই তাদের তালিকা তৈরী করে রাখে আর যথারীতি মাংস বন্টন করে সম্ভব হলে বাড়ী বাড়ী পৌঁছে দেয়া হয়। কোন আহমদীকে মাংস সংগ্রহ করতে বাড়ী বাড়ী যেতে হয় না। কি সুন্দর ঐশী ব্যবস্থা! খিলাফত আছে বিধায় এ সুন্দর ব্যবস্থা। আল্লাহ্ তাআলা একে চিরস্থায়ী করুন!

এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর মলফুযাত থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের ইতি টানতে যাচ্ছি ঃ

"আসলে এ দিনে গভীর রহস্য এটা ছিল যে হযরত ইবরাহীম (আ.) যে কুরবানীর বীজ বপন করে গিয়েছিলেন এবং গোপনভাবে বপন করেছিলেন আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এর বায়ু হিল্লোলিত সবুজ শ্যামল ক্ষেত দেখিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ পুত্রকে খোদা তাআলার আদেশে জবাই করতে অস্বীকৃতি জানান নি। এতে গুপ্তভাবে এ ইঙ্গিত ছিল, মানুষ যেন দেহমনে খোদার হয়ে যায়। আর খোদার আদেশের সামনে সে তার প্রাণ, নিজ সন্তান-সন্ততি ও তার নিকট আত্মীয় স্বজনের রক্তও তুচ্ছ মনে করে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি এমন এক পরিপূর্ণ পথনির্দেশনার দৃষ্টান্ত ছিলেন যে অনেক বেশি কুরবানী দেয়া হয়েছে, রক্তে জঙ্গল প্লাবিত হয়ে গেছে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। পিতা নিজ পুত্রকে, পুত্র নিজ পিতাকে হত্যা করেছেন। এতে তারা আনন্দ পেতেন যে ইসলাম ও খোদার পথে টুকরো টুকরো হয়ে কিমা করা হলেও তাদের আনন্দ হতো। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখ, হাসি-খুশী খেলা তামাশা ছাড়া আধ্যাত্মিকতার কোন অংশ বাকী আছে কি? এ ঈদুল আযহিয়া পূর্বের ঈদের চেয়ে শ্রেয়। সাধারণ লোকও একে বড় ঈদ বলে থাকে। কিন্তু চিন্তা করে বল, ঈদের কারণে কতজন এমন আছে যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও নির্মল চিত্ততার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে অংশগ্রহণ করে থাকে? রমযানের ঈদ প্রকৃতপক্ষে একটি সাধনার ফলশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত সাধনা। আর এর নাম বজলুর রূহ অর্থাৎ আত্মাকে বিক্রি করা। আর এ ঈদ যাকে বড় ঈদ বলা হয় এর মাঝে এক মহা সাফল্য নিহিত আছে। কিন্তু দুঃখের সাথে বলতে হয়, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি" *(মলফুযাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৩১-৩২, ১৯৮৪ সনে মুদ্রিত)।*

(কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা)

১৯৪৬। হজ্জ যাত্রার প্রবর্তন 'আবুল আম্বিয়া' হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সময়ে শুরু হয়েছিল। এটা প্রতীয়মান হয় এই কথা দ্বারা : 'তুমি সকল লোকের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা কর।' কোন কোন খৃষ্টান লেখকের ধারণা যে, হজ্জ হচ্ছে নবী করীম (সা.) কর্তৃক আরবদের প্রতিমা উপাসকদেরকে বশীভূত করবার জন্য

ইসলামের মধ্যে প্রতিমা পূজা-ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা; কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সময় থেকে আরম্ভ করে হজ্জব্রত অব্যাহতভাবে চলে আসছে, দূর-দূরান্তের দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মক্কাতে এই সমাবেশ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতার অখন্ডনীয় সত্যতা বহন করে।

১৯৪৭। একজন মুসলমানের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ছাড়াও হজ্জব্রত সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এটা বিভিন্ন জাতির মুসলমানদেরকে এক শক্তিশালি আন্তর্জাতিক ইসলামের বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানেরা বৎসরে একবার মক্কায় একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহ বিষয়াদির নবায়ন এবং নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তারা অন্যান্য দেশের মুসলিম ভাইদের অবহিত হওয়া বা করার সুযোগ লাভ করে, একে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং বিভিন্নভাবে পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতা করবার উপায় উদ্ভাবন করতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের কেন্দ্র মক্কার হজ্জ মুসলিম বিশ্বের জন্য জাতি সংঘ সংস্থারূপে কাজ করতে পারে।

১৯৫২। 'নাসাকালিল্লাহে' অর্থ সে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছিল এবং স্বত:প্রবৃত্ত হয়ে অবিরাম সৎকর্ম করেছিল। 'মানসাকা' শব্দের অর্থ ত্যাগের নিয়ম-প্রণালী; যে স্থানে এরূপ অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয় (আকবার)। এই আয়াত দ্বারা কুরবানীর বিষয়-বস্তু সূচীত হয়েছে। (তিনটি মূল বিষয় বস্তুর একটি যার সম্বন্ধে এই সূরা আলোচনা করেছে) অপর দুইটি হল হজ্জ এবং জিহাদ। আয়াতটি আরও প্রতিপন্ন করে এ কুরবানী সম্বন্ধে আদেশ কেবল ইসলামের মধ্যেই সার্বজনীন, কারণ এটা এক অভিন্ন ঐশী সূত্র থেকে উদ্ভুত। আয়াতে আরও প্রমাণিত হয় যে, এটা পশুরই কুরবানী ছিল যা আদিকাল থেকেই সকল ধর্মের অনুসারীদের ওপর নির্দেশ করা হয়েছিল এবং মানুষ বলির নিষ্ঠুর প্রথা পরবর্তী কালের প্রবর্তন। এতদ্‌দৃষ্টে ও অকৃত্রিম কুরবানী তিন প্রকার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ঃ

(ক) এটা স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফুর্ত হওয়া উচিত;

(খ) এই কুরবানী পবিত্রতম উদ্দেশ্যে হতে হবে,

(গ) এটা পার্থিব বিবেচনা-প্রসূত কুরবানী হলে চলবে না।

১৯৫৩। আয়াতটি দুই প্রকার অর্থ বহন করে: (১) কুরবানীর নিয়ম প্রণালী সর্ব ধর্মে সর্বজনীন, যদিও এরা একে অপর থেকে আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক থেকে বহু দূর ব্যবধানে পৃথক পৃথক। এই বাস্তব ঘটনা এটাই প্রমাণ করে যে, আদিতে তারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস থেকে উদ্ভুত এবং সকল জাতির খোদাই এক ও অভিন্ন খোদা, (২) কুরবানীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ, আমাদের সর্ব প্রকার ধারণা কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ্ তাআলার জন্য ত্যাগ করে তাঁর তৌহীদ অর্থাৎ একত্ব উপলব্ধি করা এবং ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা, ক্রুদ্ধ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নয়, অথবা কারও পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারও নয়, বরং আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কুরবানী করা।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মক্কায় উটগুলিকে জবাই করা এমন এক প্রতীক-স্বরূপ যে, মানুষ তার স্রষ্টা এবং প্রভুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই হল কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে, তখন হজ্জযাত্রীকে স্মরণ করে দেয় যে, এটা আল্লাহ্‌র এক নিদর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে যে, কুবানীকৃত পশুর গোশ্‌ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

(অমৃতবাণীর অবশিষ্টাংশ ৫ম পৃঃ পর)

হয়ে যায়। আর খোদার আদেশের সম্মুখে সে তার প্রাণ, নিজের সন্তান সন্ততি ও তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের রক্তও তুচ্ছ মনে করে। রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে তিনি এমন এক পরিপূর্ণ পথ নির্দেশনার দৃষ্টান্ত ছিলেন যে, কতই না বেশি কুরবানী দেয়া হয়েছে, রক্তে জঙ্গল প্লাবিত হয়ে গেছে যেন রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছে। পিতাগণ নিজ পুত্রদের, পুত্রগণ নিজেদের পিতাদেরকে হত্যা করেছেন। এতে তাঁরা আনন্দ পেতেন যে, ইসলাম ও খোদার পথে টুকরো টুকরো হয়ে কিমা করা হলেও, তাঁদের আনন্দ হতো। কিন্তু আজ চিন্তা করে দেখো যে, হাসি-খুশী ও খেলা-তামাশা ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিকতার কোন অংশ অবশিষ্ট আছে কি? এ ঈদুল আযহা পূর্বের ঈদ থেকে শ্রেয়: এবং সাধারণ লোকও এটাকে বড় ঈদ বলে থাকে। কিন্তু চিন্তা করে বলো যে, ঈদের কারণে কত লোক আছে যারা নিজেদের আত্মশুদ্ধি ও নির্মল চিত্ততার প্রতি কতটা দৃষ্টি প্রদান করে থাকে এবং আধ্যাত্মিকতা থেকে কত অংশ লাভ করে? রমযানের ঈদ আসলে একটি সাধনার ফলশ্রুতি এবং ব্যক্তিগত সাধনা। আর এর নাম বজলুর রূহ অর্থাৎ আত্মাকে বিক্রি করা কিন্তু এ ঈদ,যাকে বড় ঈদ বলা হয়, এর মধ্যে মহান সাফল্য নিহিত আছে এবং দু:খের সাথে বলতে হয় যে, এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া হয়নি। খোদা তাআলা যাঁর দয়া গুণ কয়েকভাবে বিকশিত হয়ে থাকে। উম্মতে মুহাম্মদীয়া (সা.)-এর ওপরে খুবই উন্নত মানের এক করুণা দেখিয়েছেন যেন পূর্ববর্তী উম্মতের বিষয়াবলী ভাসাভাসা বা প্রাথমিক পর্যায়ের রঙ্গে ছিলো। এর মাহাত্ম্য এ উম্মতে মরহুমা বা করুণা লাভকারী উম্মতের মধ্যে সে দেখিয়েছে,সূরা কাওসারের মধ্যে খোদা তাআলার এই যে ৪টি গুণ বর্ণিত হয়েছে যেমন, রাব্বুল আলামীন (সমগ্র জগতের প্রভু-প্রতিপালক), রহমান (অযাচিত অসীম দাতা), রাহীম (পরম দয়াময়), মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (চিবার দিবসের মালিক) যদিও সাধরণভাবে এসব গুণ এ বিশ্বের ওপরে জ্যোতির্বিকাশ ঘটায় কিন্তু ওগুলোর মধ্যে আসলে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। লোকেরা এর ওপর কমই দৃষ্টি দেয়। *(মলফুযাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩১-৩৩, ১৯৮৪ সনে মুদ্রিত)*

খলীফাতুল মসীহ্‌গণের দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া

মাহমুদ আহমদ সুমন

ইসলাম ধর্ম বিকশিত হবার বহু পূর্ব থেকেই মর্ত্যবাসীদের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ও ধর্মের অনুসারী বৃন্দ নানা ভাব ও ভঙ্গিতে ঈদ পালন করতো। কিন্তু তাদের ঈদের নির্দিষ্ট কোন শিক্ষা বা রীতিনীতি ছিল না। একমাত্র ইসলাম ধর্মে ঈদকে সার্বজনীন রূপে রূপায়ন করা হয়েছে এবং ঈদকে ইবাদতে শামিল করা হয়েছে।

ঈদুল আযহিয়া মুসলমানদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বা বড় ঈদ। ঈদুল আযহিয়ার নাম রাখার কারণ হলো এটি কুরবানীর ঈদ। এ ঈদ যিলহাজ্জ মাসের ১০ তারিখ হজ্জের ইবাদতের শেষে উপস্থিত হয়। (হজ্জ ৯ তারিখে হয়)। অনেকে এই ঈদকে 'বকর ঈদ' বা বকরী ঈদও বলে থাকেন। হযরত রসূল করীম (সা.) এই ঈদকে ঈদুল আযহিয়া বলেই উল্লেখ করেছেন। লেখার কলেবর না বাড়িয়ে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.) এর খলীফারা ঈদুল আযহিয়া সম্পর্কে যে মত প্রকাশ করেছেন তা তুলে ধরছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এর দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া ঃ

"কুরবানীর গোশ্‌ত আল্লাহ্‌তাআলার নিকট পৌঁছায় না।" (সূরা হজ্জ, ৩৮ আয়াত)

কুরবানীর ব্যাপারে খোদা গোশ্‌তের বুভুক্ষ নন। খোদা পাওয়ার জন্য 'তাক্‌ওয়া' চাই। তিনি আমাদেরকে তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাবার একটা উপায় শিক্ষা দিয়েছেন। 'অধম উত্তমের জন্য কুরবানী করবে।' তাক্‌ওয়া তবেই লাভ করা যায়, যদি সীমাতিরিক্ত প্রশংসা না করা হয়। ধর্ম-জ্ঞান লাভ কর। কিন্তু জ্ঞানলালনকে, শিক্ষা কার্যকর করাকে উপরে স্থান দিবে। আমি শুধু শিক্ষার্থীদেরই বলছি না। এখানে যারা আছেন, সকলেই জ্ঞান অন্বেষণ করছেন। সকলেই শিক্ষার্থী। এ খুতবাও এক শিক্ষা। দেখুন, খোদাতাআলা হযরত ইবরাহীম আলইহিস্ সালামকে আদর্শরূপে উপস্থিত করছেন এবং বলছেন যে, ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামের ধর্মকে 'আত্মঘাতি' ছাড়া কেউ ধারণ করতে পারে না। ইবরাহীম আলইহিস্ সালামকে খোদাতাআলা সম্মানিত করেছেন। তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আত্ম-সংস্কারকের অন্যতম।

যাবতীয় প্রেম, শত্রুতা ও কার্যে নীচকে উচ্চের জন্য কুরবান করবার প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। তাহলে আপনারা ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামের অনুরূপ পুরস্কার পাবেন। আজ্ঞাপালনকারীদের পথ অবলম্বন করবেন। আমি তো হযরত সাহেবের (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালামের) মজলিসেও কুরবানীর শিক্ষাই গ্রহণ করতাম। তিনি যখন কিছু বলতেন, তখন আমি অনুসন্ধান করতাম যে, আমার মধ্যে তো এ দোষ নেই?

খোদাতাআলার হুযুরে প্রিয় হওয়ার জন্য রসূলের অনুবর্তিতা অত্যাবশ্যক।

(সূরা আলে ইমরান, ৩২ আয়াত)

"বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তবে আমার আদর্শ পালন কর, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন।" (সূরা আলে ইমরান ৩২ আয়াত)

সারা দুনিয়া কুরবান করে দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের অনুবর্তিতা করতে হবে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম কত বড় কুরবানী করেছিলেন যে, খোদাপ্রেম প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁকে বিশিষ্ট 'মাহবুব' বলে দেখা যাচ্ছ।

যে কুরবানী করে আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। সে আল্লাহ্ তাআলার 'অলি' (বন্ধু) হয়ে পড়ে। তারপর তাকে 'প্রেম-প্রকাশক' করা হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে 'উবুদিয়ত' দেন। এ মাকামে পৌঁছিয়ে অনন্ত উন্নতি করা যেতে পারে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকেও আল্লাহ্ তাআলা বলেছিলেন, "আস্‌লিম" (আত্মসমর্পন কর)। তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন 'আসলামতু লে রাব্বিল আলামীন' (আমি সর্বজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্ম-সমর্পন করলাম")

যাহোক 'উবুদিয়ত'এর এ সম্বন্ধ দৃঢ় হওয়ার পর এতে 'ইসমাত' (নিষ্পাপ অবস্থা) জন্মে এবং খোদা তাআলা এরূপ ব্যক্তিকে তবলীগ করবার সুযোগ দেন। তারপর, তার এক প্রকার ধাত (স্বভাবজাত চরিত্র) হয়ে পড়ে। কেউ মানুক বা না মানুক তার মধ্যে এক প্রকার সহানুভূতি জন্মে এবং হৃদয়গ্রাহী প্রত্যক্ষ বাক্য দ্বারা সে লোককে সৎকাজের উপদেশ দেয়। তারপর সময় আসে যখন প্রত্যাদেশ হয়, লোকের নিকট 'এরূপ বল'। ব্যক্তি যত উন্নতিই করতে থাকে, খোদার অনুগ্রহ বাড়ে এবং মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেতেই থাকে।

কুরবানীর দৃশ্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর। নিজ নিজ আমল (কর্ম) পরীক্ষা করুন। কথা, কাজ, আনন্দ, আচরণ ও লোকের সাথে মেলামেশা সব বিষয়ই ভেবে দেখুন অধমকে উত্তমের জন্য বর্জন করছেন কিনা? যদি করেন, তবে 'মুবারক' (ধন্য)।

ত্রুটিযুক্ত কুরবানী আমাদের ছাড়তে হবে। আপনাদের কুরবানীতে কোন প্রকার খুঁত যেন না থাকে। শিং-কাটা, কান-কাটা না হয়। কুরবানীর তিনটি উপায় আছে।

ইস্তেগফার, (২) দোয়া ও (৩) সৎ-সঙ্গ। মানুষ সঙ্গ দ্বারা মহাফল লাভ করে। সাধুসঙ্গ লাভ করবেন। কুরবানীর জন্য তিন দিন। যে আধ্যাত্মিক কুরবানী করে, সে জানে সবই তার জন্য সমান। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, ৩ জানুয়ারী, ১৯০৯)।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এর দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া ঃ

হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর স্মরণে আজ কুরবানীর ঈদ; আমি কয়েকবারই বলেছি যে, জনসাধারণ যেভাবে বলে থাকে,

হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানী সেই রকমের ছিল না। লোকে বলে থাকে, হযরত ইসমাঈল (আ.) কে জবেহ্ করার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁকে জমীনে শায়িত করেছিলেন, কিন্তু পরে খোদা তাআলার কাছ থেকে ইলহাম পেয়ে জবেহ্ করবার সংকল্প ত্যাগ করেন এবং আল্লাহ্‌র ইঙ্গিতে তাঁর স্থানে এক দুম্বা জবেহ্ করেছিলেন। আমি বার বার বলেছি যে, প্রকৃত অর্থে হযরত ইসমাঈল (আ.)কে মক্কার মরু প্রান্তরে ছেড়ে আসবার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ.)কে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। কারণ পানি ও তরুলতাহীন প্রান্তরে বসতি স্থাপন করা এক মস্ত বড় কুরবানী–উদাহরণস্বরূপ যেমন দেখা যায় রাবওয়া মোকামে প্রথম প্রথম কতিপয় ব্যক্তি তাবু খাঁটিয়ে একে আবাদ করবার জন্য বসে গিয়েছিলেন। ঐসব ব্যক্তি প্রকৃত ভাবে তখন ইসমাঈলী সুন্নত পুরা করেছিলেন। তাদের এখানে বসবাসের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, রাবওয়া যেন শীঘ্রই আবাদ হয়ে যায়। যদি তারা কুরবানী না করতেন এবং রাবওয়া মোকামে এসে বসতি স্থাপন না করতেন, তাহলে এই শহর প্রতিষ্ঠিত হতো না, এখানে বাজারও বসতো না, ঘরবাড়ীও স্থাপন হতো না এবং এই জায়গা পূর্বের মতই শূন্য প্রান্তর রয়ে যেতো।

....মোট কথা হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর বিষয়টি ভুল আকারে প্রচারিত করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) এর স্বপ্নের অর্থ ছিলো যে তিনি স্বেচ্ছায় জেনে বুঝে যে মক্কা জল ও তরুলতাহীন এক প্রান্তর এবং যেখানে কোন আহার্য বস্তু পাওয়া যায় না– সেখানে যেন তিনি আপন স্ত্রী ও পুত্রকে ছেড়ে আসেন। তিনি এমনই করলেন। যখন হযরত ইসমাঈল (আ.) বড় হলেন, তখন তিনি তাঁর সাধুতা ও সততার দ্বারা নিজের চারদিকে এক দল লোক জমা করে নিলেন এবং তাদেরকে নামায, যাকাত, সদকা এবং খয়রাত বিষয়ে শিক্ষা দেন। ওমরা হজ্জের পন্থা প্রতিষ্ঠা করে মক্কাকে আবাদ করতে আরম্ভ করেন। তদনুযায়ী তাঁর কুরবানীর ফলে শত শত বর্ষ থেকে মক্কা আবাদ হয়ে আসছে।

....সুতরাং ঈদুল আযহিয়ার কুরবানী নিঃসন্দেহে উক্ত কুরবানীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এটা সেই কুরবানীর স্মরণে নয় যাতে হযরত ইবরাহীম (আ.) বাহ্যিকভাবে হযরত ইসমাঈল (আ.) এর গলায় ছুরি চালিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে কুরবানীর ঈদ আমাদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করে যে, আমরা যেন খোদার উদ্দেশ্যে এবং তারপর ধর্মের জন্যে জঙ্গলে প্রান্তরে চলে যাই এবং সেখানে গিয়ে খোদা তাআলার নাম ঘোষণা করি এবং মানুষকে তাঁর রসূলের কলেমা পড়াই যেভাবে আমাদের সম্মানিত সূফীগণ করে এসেছেন। যদি আমরা এমন করি তাহলে আমাদের কুরবানী হযরত ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর সমতুল্য হবে। (১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ পাক্ষিক আহমদীর সৌজন্যে)

তিনি (রা.) আরো বলেন, রোযার মাসের ঈদে তো এ বাণী দেয়া হয়েছে, মানুষকে সেই সময়ের জন্য প্রস্তুত থাকা আবশ্যক যখন প্রভুর পক্ষ থেকে আহ্বানকারী আসে। তারা খাবার, পানীয়, স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ব্যস্ত থেকে সময় বের করে তাঁর সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেভাবে তারা রমযান মাসে এর অনুশীলন করছিল। আর কুরবানীর ঈদে শিখানো হয়েছে কেবল বাহ্যিক পুরস্কারই নয় বরং অভ্যন্তরীণ পুরস্কারের থেকেও যদি পৃথক হতে হয় এবং নিজ প্রাণ উৎসর্গ করতে হয় তাহলেও কুণ্ঠাবোধ করে না । যখন তোমাদের মাঝে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে তখন তোমাদের ঈদই আসল ঈদ হবে।

সবচেয়ে পূর্ণ মু'মিন নবী হয়ে থাকেন। আর নবীদের নেতা হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমরা এ পরিপূর্ণ মানুষের সাথে পরিপূর্ণ রঙে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হতে দেখি। তিনি এমন হিজরত করেন যা আর কেউ করে নি। নিজের প্রাণ খোদার পথে উৎসর্গ করেন তো এমনভাবে করেন যা আর কেউ করবে না। এর দৃষ্টান্তও তাঁর মাঝে অতুলনীয়। অবশিষ্ট নবীদের ধর্ম নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কিন্তু আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ পুরস্কার লাভ হয় যে, তাঁর (সা.) সিলসিলা (জামাআত) কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। (আল্লাহ্) বলে দিয়েছেন, তোমার বাগান শুকিয়ে যাবে না। যখনই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে তখন এক মালিকে পাঠানো হবে। তিনি একে পুনরায় সবুজ-শ্যামল করে দিবেন অর্থাৎ ধর্মের সংস্কারের প্রতি ইঙ্গিত, (সুনানে আবূ দাউদ, কিতাবুল মলাহেম) আল্লাহ্ তাআলা তাঁর (সা.) বাগানের পাদদেশে এমন সব নদ-নদী প্রবাহমান রেখে দিয়েছেন, এগুলো গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে চলে এগুলোকে সবুজ-শ্যামল বানিয়ে দেয়। যে-ব্যক্তি এ শিক্ষার ওপর আমল করে সে সালেহ্, শহীদ ও সিদ্দীকদের দলভুক্ত হয়ে যায় আর নিজ যোগ্যতানুসারে ঐশী, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক পুরস্কার থেকে মর্যাদাপুর্ণ অংশ লাভ করে এবং এর বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়ালে সে পরাজিত হয়। দেখ, এক নিরক্ষর থেকে নিরক্ষর আহমদীকেও গয়ের আহমদী মোল্লা ভয় পায়। অতএব **একজন আহ্বানকারীর আহ্বান শুনাটাই হলো সত্যিকারের ঈদ।**

যেহেতু এটা ঈদ উৎসব তাই লোকেরা কুরবানী করবে। অতএব এটা বর্ণনা করে দেয়াও সমীচীন–**লা ইঁয়া নালাল্লাহা লাহুমুহা ওয়া লা দিমাউহা ওয়া লাকিইঁয়ানালুহুত্তাক্বওয়া মিনকুম** (সূরা হাজ্জ ঃ ৩৮) অর্থাৎ কুরবানীর মাংস ও রক্ত আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না। কেননা, রক্ত তো মাটিতে মিশে যায় আর মাংসও পৌছে না। কেননা, তা তো তোমরা খেয়ে ফেল। হাড়-গোড় দূরে ফেলে দেয়া হয়। তাহলে পরে এ কুরবানীর উপকার কী? **ওয়া লাকিইঁ য়ানালুহু ত্তাক্বওয়া মিনকুম**– তোমাদের তাকওয়া খোদা পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। আর এর উদ্দেশ্য এই, নিজ সত্তাকে কুরবানী করে দাও। কুরবানীর সময় মু'মিন অঙ্গীকার করে, যেভাবে এ ছাগল তার মাথা সামনে এগিয়ে দিয়েছে সেভাবেই নিজের আত্মার ধ্যান-ধারণা হে আমার প্রভু! তোমার ইচ্ছার মোকাবেলায় ছুরি দিয়ে কেটে ফেলছি আর এটাই সেই

কথা যা খোদার প্রত্যেক আহ্বানকারী নিজ সময়ে আল্লাহ্ তাআলার লোকদের কাছে চেয়ে থাকেন এবং এটা সেই প্রকৃত ঈদ। প্রত্যেক মু'মিনের এটা প্রত্যাশা করা উচিত।

আল্লাহ্ তাআলা সৌভাগ্য দিলে আমরা আত্মার কুরবানী দিতে পারি। দুর্বলতা দূর হোক। পুণ্যবান বান্দাদের ভাল ভাল পুরস্কার লাভ হোক। আর আমাদের সেই ঈদের সৌভাগ্য লাভ হোক যাতে কোন দুঃখ না থাকে। এতে ঈদ পালনকারীদের মাথায় খোদার অনুগ্রহের ছায়া থাক। এ ঈদের দিনে কোন সন্ধ্যা না নামে, আমীন (আল্ ফযল ৩১, অক্টোবর, ১৯১৫ 'খুতবাতে মাহমুদ'-এর বরাতে)।

তিনি আরো বলেন, আজ ঈদুল আযহিয়া। অর্থাৎ কুরবানীর ঈদের দিন। আমি দেখেছি, এমনিতে তো এ ঈদে কেবল হজ্জের উপলব্ধি ছাড়া মুসলমানের সৌভাগ্যশালী লোকেরাও অনেক কম কুরবানী করে থাকে। কিন্তু রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোটি কোটি উম্মত লাভ হওয়ায় এ ঈদুল আযহিয়া এভাবে হয়ে গেছে। অতএব বলা হয় এখন মুসলমানদের সংখ্যা ৬০ কোটি (বর্তমানে ১২০/২৫ কোটি বলা হয়ে থাকে)। এ ৬০ কোটি মুসলমান থেকে প্রত্যেক কোটিতে একজন মুসলমানও সুন্নতে রসূল (সা.)-এর ওপর সঠিক ভাবে আমলকারী হলে ৬০ ব্যক্তি কুরবানীকারী হিসেবে বের হবে। আর এভাবে প্রতি লাখে এক ব্যক্তি সুন্নতে রসূল (সা.) এর ওপরে আমল করলে ৬ হাজার মুসলমান কুরবানীকারী বের হয়ে আসবে। আর এভাবে এ ঈদ প্রকৃত অর্থে ঈদুল আযহিয়াতে পরিণত হয়ে যায়। যদিও রসূল করীম (সা.) এ ঈদের নাম ঈদুল আযহিয়া রেখে বলেছেন, তাঁর উম্মতকে আল্লাহ্ তাআলা এত বৃদ্ধি করবেন যে, এ উপলক্ষে এদের থেকে খুব কম কুরবানীকারীও যদি হয় তাহলে তাদের কুরবানীর একটি বড় স্তুপ হয়ে যাবে। অতএব এ ঈদ বড়ই জাঁকজমকপূর্ণ ঈদ হবে যার দৃষ্টান্ত দুনিয়াতে আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এ উপলক্ষে লোকেরা ছাগল, দুম্বা প্রভৃতি কুরবানী করে থাকে কিন্তু কুরআন করীম বলে **"লাইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়ালা দিমাউহা ওয়া লাকিইয়া নালুহু তাক্ওয়া মিনকুম"** অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলার কাছে এসব কুরবানীর মাংস বা রক্ত পৌঁছে না বরং কুরবানীকারীদের তাক্ওয়া পৌঁছে থাকে (২২ ঃ ৩৮)। অতএব আসল কুরবানী হতো তা, যা মানুষ নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে উপস্থাপন করে থাকে আর এটাই শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ঈদুল আযহিয়া আমাদেরকে এটাই শিখায়। অতএব দেখে নাও যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত ইসমাঈল (আ.) ও হযরত হাজেরা (রা.) কে এক পানি বিহীন মরুভূমিতে ছেড়ে আসলেন (১৪: ৩৮) তখন যদিও তিনি স্বয়ং সেই মরুভূমি থেকে বাইরে চলে গেলেন কিন্তু তাঁর কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে আলাদা রেখে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন। তাঁর স্ত্রীর কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের স্বামীর পৃথক হওয়ার কারণে দুঃখ-কষ্ট পেয়েছিলেন। আর নিজের পুত্রের কষ্ট দেখেছিলেন এবং পুত্রের কুরবানী ছিল এই, তিনি নিজের ইচ্ছায় এমন এক মরুভূমিতে বসবাস করলেন যেখানে অনেক দূর দুরান্তেও মানুষ দেখা যেত না। তিনি একাই কেবল ক্ষুধা ও পিপাসার কষ্ট সহ্য করেননি বরং মা-বাবার কষ্টও দেখেছেন। অতএব সেই কুরবানী কোন একক ব্যক্তির ছিল না। হযরত ইবরাহীম (আ.), হযরত হাজেরা (রা.) ও ইসমাঈল (আ.)কে এক পানি প্রভৃতি শূন্য মরুভূমিতে ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে এক কুরবানী করতে হয়েছিল। আমি মনে করি প্রকৃতই আজ প্রত্যেক মুসলমান যদি এ অর্থে ঈদ পালন করতে থাকে আর দুম্বা ও ছাগল কুরবানীর সাথে সাথে নিজেদের আর নিজেদের সন্তান সন্ততির কুরবানী করতে থাকে তহলে বিশ্বের কোন শক্তি তাদেরকে ধ্বংস করতে পারবে না।

ঈদুল আযহিয়া আমাদের মাঝে এরকম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে চায়। আমরা আমাদের মাঝে যদি ইবরাহীমি আত্মা সৃষ্টি করে নেই আর পাকিস্তানীরা খোদার পথে মৃত্যুকে বরণ করে নেয় তাহলে তারা অবশ্যই পৃথিবীর ওপর বিজয় লাভ করতে পারে। কিন্তু শর্ত এই, যেভাবে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী ও পুত্রের কী হবে এর কোনই পরওয়া করেন নাই সেভাবে তাদের স্ত্রী পুত্রের কী হবে পাকিস্তানীরাও এটা মনে করবে না। খোদা তাআলা যখন হযরত ইবরাহীম (আ.)কে নিজের স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রকে পানিবিহীন মরুভূমিতে ছেড়ে আসার আদেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি এ প্রশ্ন করেননি, হে খোদা! সেখানে তাদের কিভাবে চলবে। বরং তিনি কোন প্রশ্ন না করে খোদা তাআলার আদেশ পালন করেছিলেন আর বলেছিলেন, তারা ক্ষুধায় মারা গেলে মরুক গে। রোদ্রে পুড়লে পুড়ুক গে। আমাকে খোদা তাআলার আদেশ পালন করতেই হবে। পাকিস্তানীদের মাঝে যদি এ আত্মা সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাদের স্ত্রী পুত্রের মরতে হলে মরতে দিতে হবে। তারা জন্মভূমির সুরক্ষার খাতিরে কোন প্রকার বাহানা দেখাবে না। তাহলে দেখতে থাক সফলতা কিভাবে তাদের পদচুম্বন করে। এভাবে এ আত্মা আমাদের জামাআতের লোকদের মাঝেও যদি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে আমাদের তবলীগ খুবই ব্যাপকতা লাভ করতে পারে.....।

.....অতএব তোমরা এমন ঈদ উৎসব পালন কর যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা আদেশ দিয়েছেন। পরে দেখবে, খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণরাশি কিভাবে অবতীর্ণ হতে থাকে। খোদা তাআলার রসূল (সা.) এর প্রতি দুরূদ পাঠাও আর বার বার দুরূদ পড় যা নামাযে তোমাদেরকে শিখানো হয়েছে। (১৯ জুলাই, ১৯৫৬ রাবওয়ায় প্রদত্ত, আল ফযল, ১০ জুন, ১৯৫৯)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া ঃ

আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের সকলের জন্য এ ঈদ এ রঙ্গে মুবারক করেন যে, এ ঈদের সাথে যে সকল কুরবানী ও আত্মত্যাগের সম্পর্ক এবং ঈদের ফলশ্রুতিতে কুরবে ইলাহী (ঐশী নৈকট্য)

প্রাপ্তির যে সকল পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে তা যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য খুলে দেন এবং স্বীয় রহমত ও কল্যাণরাজী দ্বারা আমাদের অবিষিক্ত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এক রুইয়া (স্বপ্ন) দেখেন এবং তদনুযায়ী এটা বাহ্যতঃ পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে হযরত ইসমাঈল (আ.)কে জবাই করার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা বল্লেন যে, তোমাকে স্বপ্নে যে আদেশ দান করা হয়েছে, তা সন্তানের বাহ্যিক হত্যা বা আত্মহত্যা নয় বরং নফ্স এবং সন্তানের কুরবানীর নির্দেশ বহণ করে। মৃত্যুর বিবিধ রূপ ও আকার প্রকৃতি আছে। মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যায় অথবা কোন ঘাতকের হাতে প্রাণ হারায়, ইত্যাদি ভিন্ন কারণে জীবন সূত ছিন্ন হয়ে পড়ে। যে মৃত্যু শাহাদত রূপে আসে কিংবা যে মহান কুরবানী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নিকট চাওয়া হয়েছিল, তার মোকাবেলায় অপরাপর মৃত্যু কোনই মর্যাদা বা মূল্যবোধ রাখে না। এতদভিন্ন প্রত্যেক মৃত্যুই এক সাময়িক বা তাৎক্ষণিক ব্যাপার, কিন্তু এটা আজীবন ও সার্বক্ষণিক মহান কুরবানীর ব্যাপার, যা মানবাত্মা, তার বিবেক ও আবেগে এক আলোড়ন এবং জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে। সুতরাং আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমরা এক স্বর্গীয় উপকরণ স্বরূপ 'যিবহে আযীম' বা মহান কুরবানীকে নির্ধারণ করেছি। ইহা এক দিকে যেমন যিবহে আযীম, অন্যদিকে নাযাতেরও কারণ। ইহা মৃত্যুও বটে, আবার জীবনেরও উৎস। সেজন্য "তারাকনা আ'লাইহে ফিল আখেরীন" আমরা এ রীতিকে পরবর্তী জাতিসমূহেও পরিচালিত করেছি, এবং হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে তার পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তা চরম শিখরে উপনীত হয়....।

.....হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং তাঁর সন্তান ও বংশধরের মাধ্যমে কুরবানীর এই রীতি ও আদর্শ কায়েম করা হয়েছে এবং এতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি মহৎ। সমস্ত প্রাণীই তাঁর জন্য উৎসর্গ হবে, যেমন হজ্জের সময়ে সহস্র সহস্র বা লক্ষ লক্ষ সংখ্যক পশু এ মহান কুরবানী বা আত্মত্যাগের স্মৃতিচারণ হিসাবে প্রতি বৎসরই কুরবানী হচ্ছে। এতে মানুষকে এ সবক বা শিক্ষাই দেওয়া হয়েছিল যে, পৃথিবীর প্রত্যেক সৃষ্টি ও সকল প্রাণীই মানুষের উদ্দেশ্যে কুরবানী হবে, এবং মানুষ খোদার বান্দায় পরিণত হওয়ার জন্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে এরূপ এক জীবন অবলম্বন করবে যার মধ্যে প্রতি মহূর্তে সে এক মৃত্যু নিজের ওপর গ্রহণ করবে। সে তার নফ্সকে বিলীন করবে, তবেই তাকে খোদা তাআলার তরফ থেকে এক নতুন 'নফ্স' বা আত্মা দান করা হবে, যার মধ্য হতে সদা 'রাজিতু বিল্লাহি রাব্বান' ধ্বনী উত্থিত হবে। তার নিজের বলে কিছু থাকবে না–না তার নিজস্ব ইচ্ছা ও বাসনা-কামনা, না তার কোন নিজস্ব কথা, না চোখ, না কান। সে খোদা তাআলার কান দিয়ে শুনবে, তাঁর চোখ দিয়ে দেখবে, তাঁর জিহ্বা দিয়ে কথা বলবে। এটা এ অর্থে নয় যে, খোদা তাআলা তাঁর সত্তায় পার্থিব ও বাহ্যতঃ অবতীর্ণ বা রূপান্তরিত হবেন, বরং এটা উত্তেজনাকে এবং তার সকল প্রকার শক্তি, ক্ষমতা ও যোগ্যতাকে তার রবের জন্য কুরবান করবে। তাহলে খোদা তাআলা তাকে এক নতুন জীবন দান করবেন। সেই নতুন জীবনে অভিষিক্ত হয়ে তার দ্বারা যে কার্যই সম্পাদিত হবে এবং যে সকল শক্তির অভিব্যক্তি ঘটবে তার সম্বন্ধে আমরা আলঙ্করিক বা রূপকের ভাষায় এটা বলতে পারি যে, মানুষ খোদা তাআলার চোখ দিয়ে দেখছে, খোদা তাআলার কান দিয়ে শুনছে, খোদা তাআলার ইন্দ্রিয়সমূহ দিয়ে অনুধাবন বা প্রত্যক্ষ করছে এবং খোদা তাআলার মুখ দিয়ে তার ভাষণ নিঃসৃত হচ্ছে, অর্থাৎ তার নিজস্ব কোন কিছুই নাই, সব কিছুই সে খোদা তাআলার কাছে সমর্পন করে দিয়েছে। মানুষের এক মৃত্যু তো সাময়িক ভাবে আসে, যা এক মুহূর্তের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায়। কিন্তু এক মৃত্যু এরূপ আছে, যা মানুষের সমগ্র জীবনকে স্বীয় বেষ্টনীর মধ্যে ধারণ করে। এটাই সেই মৃত্যু যার উৎস হতে অনন্ত জীবনের ধারা উৎসারিত হয়.....।

.....আল্লাহ্ তাআলার এটাই ফয়সালা যে, সকল মানুষকে একই পতাকার নীচে সমবেত করা হবে। পতাকা হলো হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা। সমগ্র মানবজাতিকে, তারা দুনিয়ার যে কোন দুর-দুরান্ত অংশেই বাস করুক না কেন, একমাত্র হাত বা মুঠির মধ্যে একত্রিত করা হবে। সেই হাত ও মুঠিই হলো হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাত ও মুঠি, যার সম্বন্ধে খোদা তাআলা বলেছেন যে, ওটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত নয় এটা আমার হাত। খোদা তাআলার এ হাতের প্রভাব ও পবিত্র শক্তি, ক্ষমতা ও পরাক্রম বর্তমানেও ঠিক সেভাবেই প্রকাশিত হবে যেভাবে ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রকাশিত হয়েছিল।

এ বুনিয়াদী সত্য এবং এ শুভ সংবাদ, আমরা যারা আহমদীয়াতের দিকে আরোপিত হই, আমাদের নিকট কুরবানী চায়–সেই কুরবানী, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পুত্রগণ এবং বংশধরগণ খোদা তাআলার সমীপে পেশ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রূহানী পুত্র ও সন্তানগণের নিকটও সেই কুরবানীরই তাকীদ ও দাবী জানায়। এ কুরবানীর জন্য আপনারা প্রস্তুত হন, যাতে আপনারা আল্লাহ্ তাআলার হুকুমত ও কল্যাণরাজীর ওয়ারিশ হতে পারেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে প্রকৃত কুরবানী পেশ করার তৌফিক দিন। (১৬ জানুয়ারি, ১৯৭৩ মসজিদে আকসা, রাবওয়া, সাপ্তাহিক বদর, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৭৩)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া ঃ

আমরা যে পশু কুরবানী করে থাকি তা করতে গিয়ে অনেক সময় আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এটা ভুলে যাই যে, প্রত্যেক এই কুরবানীর মাঝে এক পয়গাম (গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা) নিহিত থাকে। আর মৌলিক ও মোক্ষম পয়গাম হচ্ছে এই যে, এইসব কুরবানী (পশুর) মাংস এবং রক্ত আল্লাহ্র কাছে যাবে না। তা তোমরা

নিজেদের মধ্যেই বন্টন করবে। বড় জোর গরীব ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়ে তার কিছুটা কল্যাণ সাধন করবে এবং এর বিনিময়ে তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবে। অথবা নিজেদের নিকটাত্মীয় ও প্রিয়জনদের মাঝে মাংস বন্টন করবে। আর ধারায় 'ইতায়ে-যিল্‌কুরবা' (আত্মীয়স্বজনকে দান করার ন্যায় অন্যদেরকেও দান করা) সম্পর্কীয় আদেশটির কিছুটা বাস্তবায়ন ঘটবে। (তাতে সন্দেহ নেই)। কিন্তু এসবই তোমাদের নিজেদের (সীমিত গন্ডীতে) ফায়দার বিষয়। বস্তুত: কুরবানী প্রদানকারী ব্যক্তির তাক্‌ওয়া (খোদা ভীতি ও প্রীতিমূলক আন্তরিক নিষ্ঠা) খোদা তাআলার সান্নিধ্যে পৌঁছে থাকে। আর এই কুরবানীগুলি যদি তাকওয়া শূন্য হয়, তাহলে এগুলো হয়ে থাকে নিরেট গতানুগতিক প্রথা। এরচে বেশী এগুলোর কোনই মূল্য নেই। আমি অনুভব করেছি, অধিকাংশ কুরবানী প্রদানকারী পশু যবাই পর্যন্তই নিজেদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখেন এবং মনে করেন যে, ঐদিন তারা কেবল কতগুলো পশু কুরবানী দিয়ে যাতে এর ফায়দা উঠাতে পারেন। অথচ কুরবানীর যে (যবাই করা সংক্রান্ত আত্মোৎসর্গের) রূহ্ বা চেতনাবোধ রয়েছে, তা তাদের অন্তরে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে ও তা তাদের হৃদয়কে স্পর্শও করে না। অথচ এর মাঝে এক পয়গাম নিহিত রয়েছে। বস্তুত: সে পয়গামটি ইঙ্গিত দিচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দিকে। তিনি (আ.) যে তাঁর পুত্র ইসমাঈলের গলায় ছুরি চালাতে অবিচল উদ্যোগ দেখিয়েছিলেন পিতা ও পুত্র (আলায়হুমাস্ সালাম) উভয় নিজ নিজ ভূমিকা পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন এবং ঐভাবে নিজেদের কুরবানী দিতে আল্লাহ্‌র সমীপে সমর্পণ করেছিলেন, সেই কুরবানীরই স্মৃতি বহন করে থাকে ঈদুল আযহার এই কুরবানী।

উল্লেখিত সেই কুরবানীর প্রাণ যদি এই কুরবানীগুলোতে সক্রিয় না হয় তাহলে এর কোনও ফায়দা নেই। তা কেবল খাবার-দাবার ও কাবাব তৈরীর একটা সাময়িক প্রথা হিসেবেই অনুষ্ঠিত হয়। এর অধিক কোন মূল্য থাকে না। ..... আজ এবং ভবিষ্যতেও যখন কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানো হয় তখন এদের ছট্‌ফট্ করতে দেখে আপনারা নিজেদের অন্তরে এই (স্থির) ধারণা পোষণ করবেন যে, আপনাদের আত্মারও অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র হুযূরে কুরবান হওয়া উচিত। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ওগুলো ছট্‌ফট্ করতে করতে (অবশেষে) স্থির ও শীতল হয়ে পড়ে, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত না তা খোদা তাআলার সমীপে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত হয়ে প্রশান্তি লাভ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের কুরবানীর রূহ্ আল্লাহ্‌র নিকট গৃহীত হতে পারে না। তখন ঐ রূহ্ ও আত্মচেতনা থেকে মানবজাতি যে ফায়দা লাভ করবে, তা (যদিও) এমনই হবে, যেমন মানুষেরা আপনাদের কাছ থেকে বাহ্যত: মাংস ইত্যাদি পেয়ে থাকে, কিন্তু উল্লেখিত আপনাদের খোদার সমীপে সমর্পিত ও প্রশান্ত আত্মা থেকে মানবজাতি আরও উন্নত ও উৎকৃষ্ট সব রকম ফায়দা লাভ করতে থাকবে। এটা সেই কেন্দ্র বিন্দু যা আপনাদের সব সময় স্মরণ থাকা উচিত এবং আমারও স্মরণ থাকা উচিত। কিন্তু আমরা প্রায়শ: এই জাতীয় মৌলিক বিষয়গুলো ভুলে যাই।

...আমি আশা রাখি, এই কুরবানীর ঈদ অনেক অনেক আনন্দ এবং ঐশী-নৈকট্য লাভের কারণ হবে। এরপর সবশেষে আমি আপনাদের সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, নিজেদের গরীব ভাইদের–দুর্বলদের এবং অসহায়দেরকে কুরবানীতে অবশ্যই স্মরণ রাখুন। নিজেদের আত্মীয়-স্বজনের এবং নিজেদের জন্যও এক তৃতীয়াংশ স্বচ্ছন্দে রাখুন এবং বন্টন করুন। কিন্তু কিছু অংশ জামাআতের কাছে জমা দিন, যাতে তা গরীব-মিসকীনদের মধ্যে তারা বন্টনের ব্যবস্থা করতে পারেন এবং কিছু অংশ আপনারা নিজেরা আপনাদের চেনা-অচেনা দরিদ্রদের মধ্যে সরাসরিও বন্টন করুন। তাদের আর্থিক অভাব-অনটন লাঘব করতে যদি আপনি সচেষ্ট হন, তা হলে আমি আপনাদের নিশ্চিত আশ্বাস দিচ্ছ যে, তাদের দারিদ্র ও অভাব-অনটনের ওপর আপনাদের দৃষ্টি পড়ার দরুন আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টি আপনাদের ওপর পড়বে এবং আপনাদের দুর্বলতাকে আল্লাহ্ দূর করবেন। অতএব, অনেক বড়ো ব্যবসা! গরীবদের তালাশ করা এবং তালাশ করে তাদের কাছে পৌঁছা এটা হাত ছানি দিয়ে আমন্ত্রণ জানায়, আল্লাহ্ যেন আপনাদেরকে তালাশ করেন এবং আপনাদের কাছে পৌঁছেন। এমনটি হওয়া নিঃসন্দেহে অবধারিত। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড, ০৪/০৪/১৯৯৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ খামেস (আই.)-এর দৃষ্টিতে ঈদুল আযহিয়া ঃ

ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষ্যে আজ এবং কালকে পৃথিবীতে অগণিত প্রাণী জবাই হবে। কিন্তু এই কুরবানী এবং ঈদের আনন্দ এটাই কি একমাত্র এর উদ্দেশ্য? ছাগল, ভেরা যা জবাই করা হবে, কাবাব বানানো, খাওয়া, বন্ধু-আত্মীয়স্বজনকে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা এটিই কি কুরবানীর উদ্দেশ্য? এটি কি এমন কাজ, যে কাজে আল্লাহ্ অনেক বেশি সন্তুষ্ট হতে পারেন? বা আল্লাহ্ কি মুসলমানদের বলেছেন যে, আমি আজকে তোমাদের প্রতি একান্ত আনন্দিত, তোমরা ছাগল, ভেরা, গরু বিভিন্ন প্রাণী জবাই করছো তাই। শুধু ঈদগাহে এসে দুই রাকাত ঈদের নামায পড়াই কি যথেষ্ট? আর ইচ্ছা বা অনিচ্ছ সত্ত্বেও খুতবা শুনে নিলাম তারপর ঘরে ছুটে গেলাম আর বিভিন্ন প্রাণী জবাই করবো আর মাংস খাবো। যে দেশগুলোতে বিভিন্ন প্রাণী জবাইয়ের অনুমতি আছে সেখানে নিজেরাই জবাই করে। ইউরোপে এইভাবে অনুমতি নেই কিন্তু এখানে কোন কোন জায়গায় মানুষ কুরবানীর পশু জবাই করে থাকে। তো জবাই করার পর আমরা যদি মনে করি আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছি বা করে ফেলেছি। এটা মনে করা যথেষ্ট নয়। পাকিস্তানে আমি দেখেছি, আমরা ঈদের নামায পড়ে যখন ফিরে আসতাম তখন দেখা যেত যে অনেকেই ঈদের নামাযের ৫/৭ মিনিট

পরেই অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের ভিতরেই নিজেদের কুরবানীর পশু জবাই করে ফেলত। এর মধ্যেই দেখা যায় অনেকে গাভীর চামড়াও পৃথক করে ফেলেছে, মাংস কাটতেও দেখা যায়। এতে বুঝা যায় এরা হয়তো ঈদের নামায পড়ে না বা খুতবা শুনে না। কুরবানী পশু জবাই নিয়ে তারা চিন্তিত থাকে যে আমরা তাড়াতাড়ি যাব আর কুরবানীর পশু জবাই করে মাংস খাব।

....কুরবানী করার পিছনে কেবল এটিই উদ্দেশ্য নয় যে পশু কুরবানী করতে হবে তারপর তার মাংস খেতে হবে বরং এই কুরবানী ঈদের পিছনে কুরবানীর একটি দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, যা হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে এবং তাঁর সাথে তাঁর স্ত্রী সন্তানও এ কুরবানীতে অংশ নিয়েছেন। আর যার চূড়ান্ত পরিনতি বা পরিসমাপ্তি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সত্তায় ঘটেছে এবং তাঁর সাহাবীরাও (রা.) তাঁর কল্যাণ থেকে অংশ লাভ করে এর উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সুতরাং আমাদেরকে এটি দেখতে হবে প্রতি বছর ঈদ আসে তাতে আমরা আমাদের আধ্যাত্মিক মান কিভাবে উন্নত করতে পারি। আমাদের কুরবানীর মান আমরা কিভাবে উন্নততর করতে পারি নতুবা আল্লাহ্ তাআলা তো আমাদের এই ছাগল, দুম্বা, গরু জবাই করার প্রতি তো কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে সে উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণকারী দেখতে চান। নতুবা এ পশু কেবল জবাই করার উদ্দেশ্যে করা হয় কুরবানীর উদ্দেশ্যে নয়।

....সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, আমরা প্রতি বছর যখন ঈদুল আযহা উদযাপন করি তখন আমরা যেন এটা সন্ধান করি যা এই কুরবানীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এ কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য কী তা আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন, বলা হয়েছে **"ওয়ালা কি ইয়ানালুহু তাক্ওয়া মিনকুম"** আল্লাহ্ তাআলার কাছে তোমাদের তাক্ওয়াই শুধু পৌঁছে। কুরবানীর দর্শনকে বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, খোদা তাআলা এই শরীয়তে অর্থাৎ ইসলামে অনেক জরুরী নির্দেশ বর্ণনা করেছেন। মানুষকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, সে যেন তার নিজের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য এবং পুরোসত্তাসহ আল্লাহ্ তাআলার পথে উৎসর্গ হয়। সুতরাং বাহ্যিক কুরবানীকে এই অবস্থার একটা নমুনা করা হয়েছে, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হল সেই কুরবানী যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তোমাদের কুরবানীর মাংস আল্লাহ্ তাআলার কাছে পৌঁছে না আর রক্তও না কিন্তু তোমাদের তাক্ওয়া খোদা তাআলার কাছে পৌঁছে অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা তা গ্রহণ করেন।'

অর্থাৎ আল্লাহ্কে ততটা ভয় কর যেন তাঁর পথে তোমরা মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত। যেভাবে নিজ হাতে পশু জবাই কর একই ভাবে তোমরাও আল্লাহ্ তাআলার পথে জবাই হয়ে যাও। ... সুতরাং সকল পাপ থেকে বাঁচার জন্য নাজাত বা মুক্তি তখনই লাভ হয় যদি তাক্ওয়া থাকে, খোদার ভয় ভালবাসা যদি কামেল হয় তাহলেই এটি সম্ভব। ... হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মুক্তির জন্য কোন রক্তেরও প্রয়োজন নেই আর কোন ক্রুশে মৃত্যুরও প্রয়োজন নেই বরং আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন যে, শুধু একটি কুরবানী আমাদের প্রয়োজন, আর তা হলো নিজের নাফ্সের কুরবানী, প্রবৃত্তির কুরবানী। এমন কুরবানীর অন্য ভাষায় যার নাম হল ইসলাম। ইসলামের অর্থ হল জবাই হওয়ার জন্য নিজের ঘাড় আল্লাহ্র সামনে রেখে দেয়া। পুরো সন্তুষ্টির সাথে নিজের আত্মাকে আল্লাহ্ তাআলার আস্তানায় সমর্পণ করা এই প্রিয় নাম সমস্ত শরীয়তের প্রাণ এবং সমস্ত শিক্ষার প্রাণ আর এটিই হল ইসলাম।

আল্লাহ্ তাআলার যে নির্দেশ তার ওপর পুরোপুরি আমল করার জন্য প্রস্তুত থাকা আর প্রস্তুত হওয়ার জন্য বড় থেকে বড় কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকার জন্য প্রস্তুত হওয়া। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, জবাই হওয়ার জন্য আনন্দের সাথে সানন্দে নিজের ঘাড়কে পেশ করা কামেল ভালবাসাকে চায় এবং কামেল ভালবাসার জন্য অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন। ইসলাম শব্দ এদিকেই ইঙ্গিত করে যে সত্যিকারের ত্যাগের বা কুরবানীর জন্য কামেল অন্তর্দৃষ্টি এবং কামেল ভালবাসার প্রয়োজন অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন নেই।

..... আমাদের এইসব পশু কুরবানী তখনই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হবে যখন কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই করা হবে। (ঈদুল আযহিয়ার খুতবা, মসজিদ বায়তুল ফুতুহ্, লন্ডন, ২০-১২-২০০৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কুরবানী সম্পর্কে বলেন ঃ

খোদা তাআলা ইসলামী শরীয়তের মাঝে বহুবিধ আহকাম ও অনুশাসনের দৃষ্টান্ত ও নমুনা স্থাপন করেছেন। সুতরাং মানুষের প্রতি নির্দেশ হচ্ছে, সে যেন তার সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা এবং তার সমস্ত অস্তিত্ব সহকারে খোদা তাআলার পথে উৎসর্গীকৃত হয়। এতএব, বাহ্যিক কুরবানীগুলোকে উক্ত নির্দেশকৃত অবস্থার জন্য নমুনা বা প্রতীকস্বরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এই কুরবানী বা আত্মোৎসর্গই বটে। যেমন কিনা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'লাইঁ ইয়ানালাল্লাহা লুহুমুহা ওয়া লা দিমাউহা ওয়া লাকিইঁ ইয়ানালুহুত্ তাক্ওয়া মিনকুম।' অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তোমাদের কুরবানীগুলোর মাংস পৌঁছে না এবং সেগুলোর রক্তও পৌঁছে না। কিন্তু তোমাদের তাক্ওয়া পৌঁছে থাকে। অর্থাৎ তাঁকে এত ভয় কর যেন তাঁর পথে মৃত্যুই বরণ করো এবং তোমরা যেমন নিজ হাতে কুরবানীর পশু যবাই করে থাক, তেমনি ধারায় তোমরাও খোদার পথে যবাই হয়ে যাও। যখন কোন তাক্ওয়া এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের হয়ে থাকে, তখন প্রতীয়মান হবে যে, তা এখনও অপূর্ণ।

(তথ্য সূত্র ঃ পুরাতন পাক্ষিক আহমদী)

ইবরাহীম (আ.)-এর অসাধারণ ত্যাগ ঈদুল আযহিয়ার তাৎপর্য

জামালউদ্দিন আহমদ সৌরভ

ঈদুল আযহিয়া মানুষের সবচেয়ে স্পর্শকাতর ত্যাগের অনুভূতির সাথে জড়িত। কুরবানীর বিষয়টি সার্বজনীন, কিন্তু নিজের সন্তানকে কুরবানী করা সবচেয়ে কঠিন কাজ। কোন কোন মানুষের জন্য হয়তো সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করার চেয়ে সন্তান কুরবানী করা সহজ। কিন্তু এ ধরনের মানুষ ব্যতিক্রম, এবং এ ধরনের মানসিক অবস্থার জন্য তাদের সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায় না। মানুষের চারিত্রিক গুণাবলী সাধারণত সর্বসাধারণের মাধ্যমে নিরুপন করা হয়। শতকরা ৯৯ ভাগ, বস্তুত এরও বেশী সংখ্যক মানুষ সন্তান সন্ততির জন্য নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ ত্যাগ করে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মনোভাব এভাবেই গড়ে উঠেছে, কারও জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে। এটি মানুষের জীবনের এক বিস্ময়কর ব্যাপার এবং এর সমতুল্য কিছুই নেই। কেবলমাত্র একজন উন্মাদ ব্যক্তির পক্ষেই এটা করা সম্ভব নচেৎ সাধারণ মানুষ এর ব্যতিক্রম করে না।

ঈদুল আযহিয়া মানুষের এই সার্বজনীন ও সবচেয়ে স্পর্শকাতর অনুভূতির সাথেই সংশ্লিষ্ট। কয়েক হাজার বছর পূর্বে, ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্ কর্তৃক নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কুরবানী করার জন্য, যার জন্য মা-বাবা তাদের সমস্ত জীবন যাপন করে। এ ধরনের অস্বাভাবিক নির্দেশ পেয়েও ইবরাহীম (আ.) তৎক্ষণাৎ তৈরি হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি এই চিন্তা করেন নি যে আল্লাহ্ মানব অনুভূতি বিরুদ্ধ এক নির্দেশ দিয়েছেন। ইবরাহীম (আ.) তাঁর সিদ্ধান্তে নিঃসংকোচ ছিলেন। তাঁর বংশ রক্ষার কথা তিনি চিন্তা করেননি। তিনি বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে প্রস্তুত হলেন। কোন প্রশ্ন, কোন ব্যাখ্যা, ইতস্তত বোধ, উদ্বিগ্নতা কোন কিছুরই অবতারণা হলো না, যেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। তিনি তাঁর ছেলেকে শুতে বললেন এবং ছুরি হাতে নিয়ে প্রবল উৎসাহে মানব স্বভাব বিরুদ্ধ কাজটি সম্পাদন করতে মনোযোগী হলেন। ইব্রাহীম (আ.) এর এই সিদ্ধান্তে যে কেউই বিস্মিত হবে। সেই সময় লোকজনের এই ধারণা করাই স্বাভাবিক যে ইবরাহীম (আ.) একজন পাগল, অনুভূতিহীন ও হৃদয়হীন। কেননা তিনি যে কাজটি করতে যাচ্ছেন তা কোন অশিক্ষিত বর্বর জাতিও করতে অনুমতি দেয় না। কিন্তু কুরআনে বর্ণিত আছে, ইবরাহীম (আ.) একজন কোমল হৃদয়ের অধিকারী, জ্ঞানী, ওলী ছিলেন। সামান্য দুঃখজনক ঘটনাও তাকে পীড়া দিত, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরত।

ইবরাহীম (আ.) উন্মাদও ছিলেন না বা অনুভূতিহীনও ছিলেন না। যখন তিনি তাঁর ছেলেকে ঐশী প্রস্তাব দেন তখন পিতা-মাতার সহজাত ভালবাসা তাঁর মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। যখন তিনি জেনেছিলেন যে লুত (আ.)-এর জাতিকে শাস্তি প্রদান করা হবে, তিনি সারারাত আল্লাহ্‌র কাছে শাস্তি মওকুফের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি কোন প্রশ্ন করেননি যখন ঐশী নির্দেশ হল তাঁর ছেলেকে কুরবানী করার জন্য।

যখন হজ্জ যাত্রীরা 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বায়েক লাশারিক আলাকা লাব্বায়েক' উচ্চারণ করতে করতে কা'বা থেকে মীনা যায়, তখন তাদের মানসপটে ইবরাহীম (আ.) এর এই তৎপরতা ভেসে ওঠে। এবং ঈদের নামাযে আমরা যখন 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করি তা ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানীর মহত্ম স্মরণ করে এবং মহান আল্লাহ্ তাআলার মহিমার স্বাক্ষী হয়।

দুঃখের বিষয় আল্লাহ্ তাআলার মহিমা আমরা আমাদের জীবনে অনুভব করতে চাই না। আমরা খুবই সুন্দরভাবে 'আল্লাহু আকবার' উচ্চারণ করে ইবরাহীম (আ.) এর কুরবানীর মহত্ম ঘোষণা করি। কিন্তু আমরা চিন্তা করি না যে, এই ধরণের কাজ আমাদেরও করা উচিত। এটা মোটেও অসম্ভব কিছু নয়। এতো নয় যে ইবরাহীম (আ.) আল্লাহ্‌র বান্দা আর আমরা নই। আল্লাহ্ তাআলা কখনো ব্যর্থ হন না, ব্যর্থ হই আমরা।

আমাদের এই দুনিয়ায় মানুষ তার প্রিয় কারো জন্য অত্যন্ত আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু পরকাল এক আজব দুনিয়া। সেখানে প্রিয় ব্যক্তিই তার ভালবাসার মানুষের জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু এতে তার অবস্থানের বিন্দুমাত্রও তারতম্য ঘটে না। তিনি মানুষের দিকে এগিয়ে আসেন কিন্তু মানুষের ঔদাসীন্য তাঁর মহত্মে কোন কমতি করে না। তাঁর সত্ত্বার তল পাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি মানুষের পক্ষে তাঁর ভালোবাসার বর্ণনাও অসম্ভব যা কিনা পার্থিব ভালোবাসা হতে ভিন্ন। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভালোবাসা, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা কোন কিছুই এর তুল্য নয়। তিনি মানুষের নিকট ভালোবাসা খোঁজেন যদিও তাঁর মর্যাদা মানুষের ওপরে। মানুষ তাঁরই সৃষ্ট ক্ষুদ্র জীব, তবুও মানুষ তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।

মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার যে ভালোবাসা, তা কোন চাহিদা নয় বরং করুণা। তাঁর এই আকুল আকাঙ্ক্ষা কোন দুর্বল আবেগ নয় বরং দয়া। কিন্তু মানুষ মোটেও এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে না। সে অন্য মানুষের অধীনস্ত হতে অভ্যস্থ, কিন্তু তার সৃষ্টিকর্তা তাকে যে মর্যাদা এবং মুকুট দান করেছে তা সম্পর্কে সে উদাসীন। এই ধরণের মানুষের জন্য দুঃখ! এই ধরনের মানুষের জন্ম যদি না হতো তাহলেই ভালো হতো। এরা পশু পাখিরও অধম কেননা সেগুলোও তাদের সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন

করে। কিন্তু মানুষকে চিন্তা করার শক্তি দেয়া হয়েছে, তবুও সে তার সৃষ্টিকর্তার থেকে দূরে সরে যায়। তাকে চোখ কান দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে এগুলো যথাযথ ব্যবহার করছে না। তাকে পরকালের অমৃত স্বাদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে দুনিয়ার বিষ গ্রহণ করছে। তবুও আল্লাহ্ তার প্রতি বিমুখ হন না। তিনি যে কত মহান তা তাঁর ঐশীবাণী থেকেই বুঝা যায় : মানুষ আমার নবীকে অস্বীকার করছে কিন্তু তা আমাকে নবী পাঠানো থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আমি এখনো তাদের পাঠাচ্ছি এবং পাঠাতে থাকবো। মানুষ তাদের অগ্রাহ্য করুক, আমি তাদের আহ্বান করা বন্ধ করবো না। আমি মানুষকে এজন্যই সৃষ্টি করেছি তারা যেন আমার ইবাদত করে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা সেখানে প্রবেশ করবে সরাসরি অথবা কিছুদিন জাহান্নামের বাসিন্দা হয়ে। মানুষ যে পরিস্থিতিতেই আমার কাছে আসুক না কেন আমি তাকে ছেড়ে যাব না। তাকে আমার নিকটেই রাখব।

আমাদের খোদা এরকম। ইবরাহীম (আ.) এর এক কোমল হৃদয় ছিল। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকর্তা আর আমাদের সৃষ্টিকর্তা তো একই। সকল সৌন্দর্য তাঁর এবং সবকিছু তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। সবকিছু তাঁকে কেন্দ্র করেই পর্যবসিত। তাই চেষ্টা করা উচিত ইবরাহীম (আ.) এর মত জীবন যাপন করতে, যেরকম ভাবে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। খোদা থেকে দূরে সরে গিয়ে দুনিয়ার সাধারণ বিষয়ে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। কেননা পরকালের জীবনই প্রকৃত জীবন। এই দুনিয়ায় আমাদের অবস্থান কেবলমাত্র অতিথির মতো। সাধারণ মানুষের মত মৃত্যুবরণ করলে দুনিয়ার কিছুই যায় আসে না।

তাই এই ঈদ থেকে আমরা যেন শিক্ষা নিতে পারি সেই প্রার্থনা করা উচিত সবার।

(রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স্, জানুয়ারি ২০০৭ সংখ্যা থেকে)

সংবাদ

আনসারুল্লাহ্র ১ম ইজতেমা' ০৮ অনুষ্ঠিত

১০ নভেম্বর ২০০৮, ময়মনসিংহ।

গত ৩১/১০/২০০৮ ও ০১/১১/২০০৮ তারিখ রোজ শুক্রবার ও শনিবার ঢাকা রিজিওনাল আনসারুল্লাহ্র ১ম ইজতেমা ময়মন সিংহ জেলার মসজিদ প্রাঙ্গনে খোদার ফজলে অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। ইজতেমার প্রথম দিন সকাল ৯টা হতে বেলা ১২টা পর্যন্ত তালিমী ক্লাস হয়। তালিমী ক্লাস পরিচালনা করেন মুরব্বী সিলসিলাহ্ জনাব জাফর আহমদ ও জনাব আমীর হোসেন। অত:পর বাদ জুমুআ মোহতরম সদর সাহেব এর সভাপতিত্বে বাৎসরিক রিপোর্ট পেশ ও নসিহতমূলক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ মাগরিব MTA এর মাধ্যমে হুযূর আকদাস (আই.) এর খুতবা শ্রবণ করার ব্যবস্থা করা হয়। পরদিন শনিবার বেলা ২টা পর্যন্ত বিভিন্ন লিখিত পরীক্ষা, খেলাধূলা ও পয়গামে রেসানী ও প্রশ্নোত্তর পরীক্ষার গ্রহণ করা হয়। উক্ত ইজতেমায় বিভিন্ন মজলিসের আনসরুল্লাহ্র সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ফুলবড়িয়া ও জামালপুর এলাকার ১১ জন বয়আত গ্রহণ করেন (আলহামদুলিল্লাহ্)।

শেষ দিন বাদ যোহর রিজিওনাল নাযেম জনাব মোহাম্মদ সাদেক দূর্গরামপুরী সাহেবের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠানে ন্যাশনাল আমীর সাহেবের প্রতিনিধি জনাব আলহাজ্জ ফয়েজ উল্লাহ্ সাহেব এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল জলিল ও ন্যানাল সেক্রেটারী তবলীগ জনাব তাসাদ্দক হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুহাম্মদ আব্দুল হাই (জেলা নাযেম)
মজলিস আনসারুল্লাহ, ময়মনসিংহ।

শুভ বিবাহ

• গত ১০-১০-২০০৮ মোছাঃ শিল্পি আখতার, পিতা-মোহাম্মদ সাদেক মিয়া তারুয়া, আশুগঞ্জ, বি,বাড়ীয়া এর সাথে শাকিল আহমদ, পিতা-আব্দুল হালিম, সিমরাইল কান্দি, বি, বাড়ীয়া এর বিবাহ ১,০০,০০০/- (একলক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৪০/০৮

• গত ০৩-১০-২০০৮ মোছাঃ মরিয়ম সিদ্দিকা (মনি) পিতা-জনাব মিজানুর রহমান মোড়ল, যতীন্দ্রনগর শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর সাথে মোহাম্মদ সালাউদ্দীন আহমদ (সজল) মোহাম্মদ এমান আলী ঢালী, যতীন্দ্রনগর, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা এর বিবাহ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং ৭৪১/০৮

সেতু মেরামত

স্থানীয় মজলিসে সদস্যগণের সহযোগিতায় ২০মে ২০০৮ তারিখ খিলাফত জুবিলী উপলক্ষে সেখানকার বহুদিনের পুরাতন ৩০ হাত লম্বা ভাঙ্গা একটি সেতু মেরামত করা হয়। যার ফলে এখানে যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত হয় ও সনমনে আনন্দের সঞ্চার হয়। স্থানীয় লোকদের মধ্যে একাজের দরুন জামআতের উপর সুধারণা সৃষ্টি হয় এবং জনগণ এখন এ সেতুকে "কাদিয়ানী সেতু" বলে নামকরণ করেছে (আলহামদুলিল্লাহ্)।

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
যয়ীম
মজলিস আনসারুল্লাহ্, সরিষাবাড়ী।

ঈদ মুবারাক

পবিত্র ঈদুল আযহিয়া উপলক্ষ্যে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক -লেখিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মুবারক।

পবিত্র ঈদুল আযহিয়া সবার জীবনে বয়ে আনুক অনেক অনেক আনন্দ আর কল্যাণ।

–সম্পাদক

জামাআত ও অংগসংগঠন সমূহের কর্মতৎপরতার সংবাদ

ডেস্ক নিউজ ঃ হোসনে মোবারক

খেলাফত শত বার্ষিকী স্মারক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান

১২ নভেম্বর ২০০৮, ফতুল্লা।

গত ০৭/১১/২০০৮ তারিখ বাদ জুম্মা ফতুল্লায় মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ কর্তৃক খেলাফত শত বার্ষিকী স্মারক মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে (আলহামদুল্লিহ)। মরহুম জনাব ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব কর্তৃক সেখানে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত জায়গায় উক্ত মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হলো।

মোহতরম সদর আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ ও মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের নেতৃত্বে সকাল ১১.০০টার সময় মোটর কার ও বাস যোগে প্রায় ৬০জন আনসার ভাই বকশী বাজারস্থ মসজিদ প্রাঙ্গণ হতে ফতুল্লার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জ ও ফতুল্লার সর্বস্তরের আহমদী এবং মোহতরম মোবাশ্বের আলী নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, মোহতরম মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৩, মোহতরম আবুল খায়ের নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৪, মোহতরম এমদাদুর রহমান সিদ্দিকী প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ এবং ন্যাশনাল সেক্রেটারী উমরে আমা, তবলীগ, রিশতানাতা, ওসীয়্যত, যিরাত, ফাইন্যান্স, অভ্যন্তরিণ অডিটর, তালিম ও এডিশনাল ফাইন্যান্স প্রমুখ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ বাংলাদেশ এর নায়েব সদর আউয়াল জনাব কওসার আলী মোল্লা, নায়েব সদর সফ দওম ও কায়েদ মাল জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ, কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ মাহবুব আযম রেযা, সহ: কায়েদ উমুমী জনাব মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী, কায়েদ তালিম জনাব শহীদুল ইসলাম বাবুল, কায়েদ তরবীয়ত জনাব মোহাম্মদ গোলাম কাদের, কায়েদ তরবীয়ত নও মোবাইন মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক, কায়েদ ইছার জনাব খালেদ বিন কাসেম, কায়েদ তবলীগ জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল, কায়েদ যিহানত ও সিহতে জিসমানী জনাব মিজানুর রহমান, কায়েদ ওয়াকফে জাদীদ জনাব হামিদুর রহমান, কায়েদ তাহরীকে জাদীদ জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামি, কায়েদ তাজনীদ জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ, কায়েদ ইশায়াত জনাব আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ, কায়েদ তালিমুল কুরআন জনাব হালিম আহমদ হাজারী, অডিটর জনাব পারভেজ আহমদ ফারুকী, যয়ীমে আলা ঢাকা-১ জনাব শফিক আহমদ, যয়ীমে আলা ঢাকা-২ জনাব আখতারুজ্জামান, যয়ীম ঢাকা-৩ জনাব মাকসুদুল হক এবং রিজিওনাল নায়েম ঢাকা জনাব মোহাম্মদ সাদেক দুর্গারামপুরী, রিজিওনাল নায়েম চট্টগ্রাম জনাব শফিউল আলম বরকত ও রিজিওনাল নায়েম রাজশাহী জনাব অধ্যাপক রাজিব উদ্দিন আহমদ এবং জেলা নায়েম বৃহত্তর ঢাকা-ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনা, সিলেট, বি বাড়ীয়া, কুমিল্লা-চাঁদপুর-নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, রংপুর ও পটুয়াখালী প্রমুখ নায়েমগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর জনাব আবু নঈম আল মাহমুদ এবং সদর লাজনা ইমাইল্লাহর প্রতিনিধি। বিশিষ্ট মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উল্লেখিত মসজিদের জন্য স্থান দানকারী মরহুম আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেবের সহধর্মীনি সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাবা মাকসুদা সামাদ চৌধুরী সাহেবা।

গত বাদ জুম্মা সেখানকার পূর্বের পুরাতন মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রথমে স্বল্প সময়ের জন্য একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করা হয়। তাতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌলানা আব্দুল আযীয সাদেক সাহেব এবং উর্দু নযম পরিবেশন করেন জনাব এস এম রহমত উল্লাহ সাহেব, অতঃপর আহাদ পাঠ ও সূচনা বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম সদর সাহেব ম.আ.বাংলাদেশ। পরে স্মৃতিচারণ ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে জনাব মীর মোহাম্মদ আলী ন্যাশনাল সেক্রেটারী রিশতানাতা (সাবেক ন্যাশনাল আমীর) ও জনাব কামাল পাশা (পেসিডেন্ট, ফতুল্লা জামাত)। অতঃপর সভার সমাপনী বক্তব্য রাখেন ন্যাশনাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান।

উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মসজিদের Lay out স্থানে প্রতীকি প্রথম প্রস্তর গাঁথেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও মোহতরম সদর সাহেব (ম.আ.বাংলাদেশ)। অতঃপর পর্যায়ক্রমে ভিত্তি প্রস্তর গাঁথায় অংশ গ্রহণ করেন নায়েব ন্যাশনাল আমীরগণ, প্রিন্সিপাল জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ, সদর খোদ্দামুল আহমদীয়া, সদর লাজনা ইমাইল্লাহর প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় আমেলা ম.আ.বাংলাদেশ, ন্যাশনাল সেক্রেটারীবৃন্দ এবং রিজিওনাল ও জেলা নায়েমগণ ম.আনসারুল্লাহ। উল্লেখ্য যে, সেখানে মসজিদ নির্মাণ কমিটি ও মসজিদ নির্মাণ সংস্থা "কৌণিক প্রপারিটিজ লি." এর প্রতিনিধিবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সর্বস্তরের আহমদীদের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

সহ: কায়েদ উমুমী

মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ।

১৫তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ২০০৮ অনুষ্ঠিত

৪ নভেম্বর ২০০৮, ঘাটুরা।

গত ১৭-১৮ অক্টোবর ২০০৮ ১৫তম বার্ষিক রিজিওনাল ইজতেমা ঘাটুরাতে সম্পন্ন হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। ১৭ অক্টোবর শুক্রবার বেলা ৩ ঘটিকা হতে সন্ধ্যা ৫:৩ মি. পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ আহমদ তবসির চৌধুরী সদর

মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব সারওয়ার মোর্শেদ কায়েদ তাজনীদ, রিজিওনাল নাযেম ও চার জেলা নাযেম মৌলানা নওশাদ আহমদ (মুরব্বী সিলসিলাহ্)। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম হাবিবুল্লাহ। আহাদ পাঠ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি সাহেব। উর্দু নযম পাঠ করেন এজাজ আহমদ। উদ্বোধনী ভাষণে মোহতরম সদর সাহেব আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের পক্ষ হতে

তরবিয়তী সপ্তাহ্ যথাযথ ভাবে পালনের জন্য সকল আনসার ভাইদেরকে জোর তাগিদ প্রদান করেন। হুযূর (আই.) এর সহিত মোলাকাত প্রোগ্রমে যোগদানের জন্য তাগিদ প্রদান করে এবং কোন মজলিস যাতে বকেয়াদার হয়ে খিলাফতের নতুন শতাব্দীতে প্রবেশ না করেন এই আহ্বার রেখে ইজতেমার উদ্বোধনী ঘোষণা করেন। অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন জনাব শেখ মোশারফ হোসেন চেয়ারম্যান ইজতেমা কমিটি। অংগ সংগঠনই পারে জামাআতকে গতিশীল করতে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ মুছা মিয়া, প্রেসিডেন্ট ঘাটুরা। এরপর বক্তব্য রাখেন জনাব সারোয়ার মুর্শেদ কায়েদ তাজনীদ।

সন্ধ্যা ৬:৩০ মি. হতে নামায মাগরিব, এশা ও MTA এর মাধ্যমে যুগ খলীফার জুমুআর খুতবা দেখার পর পর প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব শুরু হয় ৭:৩০ মি. হতে ৯টা পর্যন্ত। দ্বিতীয় দিনের ইজতেমার কার্যক্রম ১৮ অক্টোবর বাদ ফজর হতে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা হয়। যা এক নাগারে ১২টা ৩০ মি. পর্যন্ত চলে। এরপর ৩:১৫মিনিটে সমাপ্তি অধিবেশন আরম্ভ হয়। সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে মোহতরম সদর সাহেবের প্রতিনিধি শফিউল আলম বরকত রিজিওনাল নাযেম সাহেবের সভাপতিত্বে জেলা নাযেমগণ, মোবাশ্বের মুরব্বী ও ঘাটুরার প্রেসিডেন্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের পর মোহতরম নওশাদ আহমদ (মুরব্বী সিলসিলাহ্) বক্তব্য রাখেন। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন সেক্রেটারী ইজতেমা কমিটি জনাব মোহাম্মদ মুসা মিয়া, সভাপতি সাহেব তার সমাপ্তি ভাষণে সাংগঠনিক কাজের দিকনির্দেশনা ও বিভিন্ন বিষয়ে আনসারদের উদ্দেশ্যে নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন এবং সবশেষে উপস্থিত সকল আনসারদেরকে কৃতজ্ঞ ও মুবারক বাদ জানান। পরিশেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণীর পর আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মনোয়ার আহমদ মিন্টু

নাযেম উমুমী

চট্টগ্রাম-বি, বাড়ীয়া-সিলেট রিজিয়ন

বার্ষিক ইজতেমা

গত ১০/১০/২০০৮ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ সুন্দরবনের ২৬তম বার্ষিক ইজতেমা খোদার ফজলে অত্যন্ত সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্)। এতে বিপুল সংখ্যক আনসারুল্লাহ্ সদস্য উপস্থিত ছিলেন ও ১১টি বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ইজতেমায় খুলনা ও কুষ্টিয়ার জেলা নাযেমগণও উপস্থিত ছিলেন। ১১/১০/২০০৮ইং তারিখ দোয়ার মাধ্যমে ইজতেমার কার্যক্রম শেষ হয়।

আহমদ আলী মোল্লা

যয়ীমে আলা

মজলিস আনসারুল্লাহ্, সুন্দরবন।

তবলীগি সেমিনার

৪ নভেম্বর ২০০৮, নারায়ণগঞ্জ।

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে গত ২৫-১০-২০০৮ইং রোজ শনিবার বিকাল ৩টা হতে ৫টা পর্যন্ত তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট মোহতরমা দিলরুবা বেগম এর সভানেত্রীত্বে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত তরজমা সহ পাঠ করেন মোহতরমা হামিদা খায়ের। অতঃপর তবলীগ বিষয়ক বক্তব্য রাখেন সেক্রেটারী তবলীগ মোহতরমা মরিয়ম বেগম। সভানেত্রীর ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে তবলীগি সেমিনার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম হাফেয মোহাম্মদ আবুল খায়ের সাহেব।

উম্মে কুলসুম

জি.এস. লাজনা ইমাইল্লাহ্ নরায়ণগঞ্জ।

'পয়গামে সুলেহ' পুস্তক এর উপর আলোচনা সভা

৪ নভেম্বর ২০০৮, নারায়ণগঞ্জ।

গত ২৪/১০/০৮ইং তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ নারায়ণগঞ্জ মজলিসে আনসারুল্লাহ্, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিরচিত পুস্তক "পয়গামে সুলেহ্" এর উপর স্থানীয় মসজিদে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত ও আহাদ পাঠের মাধ্যমে উক্ত সেমিনার শুরু হয়। সেমিনারে সভাপতিত্বের দায়িত্ব খাকসারকে পালন করতে হয়। উল্লেখিত পুস্তকের বিভিন্ন শাখার উপর বক্তব্য রাখেন জনাব আহমদ আলী, জনাব আব্দুর রশিদ, জনাব শরীফ আহমদ, জনাব বিল্লাল হোসেন খাঁ, জনাব শামসুল আলম ও খাকসার। অতঃপর দোয়ার মাধ্যমে সেমিনারের কাজ সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

যয়ীমে আলা

মজলিস আনসারুল্লাহ্ নারায়ণগঞ্জ।

ঈদুল আযহিয়ার দিনে তক্বীর পাঠ

৯ই যিলহজ্জের ফজরের নামাযের পর থেকে ১৩ই যিলহজ্জের আসরের প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে উচ্চস্বরে এ তক্বীর পাঠ করতে হয়-

"আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ"

অর্থ ঃ আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নাই। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই।

ঈদের নামাযে যাওয়া-আসার সময় এ তক্বীর বেশী বেশী পাঠ করা কর্তব্য।

(সূত্র ঃ ফিকাহ্ আহমদীয়া ঃ ১৭৯ পৃষ্ঠা)

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি তোমার প্রচারকে দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাইব।

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

www.ahmadiyyabangla.org

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায় খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও তাঁর সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু

পড়ুন

সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবার সারাংশ
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা
অমূল্য পুস্তকাদি
অমূল্য প্রবন্ধ
পাক্ষিক আহমদী
অন্যান্য প্রকাশনা

শুনুন

ঈমান উদ্দীপক বাংলা হামদ্, নাত ও অন্যান্য বাংলা নযম/কবিতা
সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান *(আসবে)*
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) *(আসবে)*
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ *(আসবে)*
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান *(আসবে)*

দেখুন

সপ্তাহান্তে খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর সময়োপযোগী নির্দেশনা *(আসবে)*
খলীফাতুল মসীহ্ (আইঃ) এর অন্যান্য অনুষ্ঠান *(আসবে)*
এম.টি.এ সরাসরি সম্প্রচার (বাংলা অনুবাদসহ) *(আসবে)*
অন্যান্য বুযুর্গ-এর তরবিয়তী ও নসিহতমূলক ভাষণ *(আসবে)*
বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান *(আসবে)*

আপনাদের দোয়া ও মূল্যবান মতামতের মাধ্যমে এ মহতী উদ্যোগকে সাফল্যমন্ডিত করুন
মতামত পাঠানোর ঠিকানা: info@ahmadiyyabangla.org

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি

Saroware Mahmud
Managing Partner

SOFTVILL

SoftVill

Perfect Solution

Shop # 716, Multiplan Centre, Level # 7
New Elephant Road, Dhaka-1208, 01670-853696, 01713097438

COMPLETE VIEW OF ADVANCED INDOOR OUTDOOR SIGNAGE & POP SYSTEMS

BRANCH OFFICE:
104, Chashmapahar
Sholoshahar 2 no gate
Nasirabad R/A, Chittagong.
Tel: 683555

HEAD OFFICE & FACTORY:
120/32, Shahjahanpur, Dhaka-1217
Tel: 9331306, Fax: 8350262
Mob: 01711344931, 01711-282439
e-mail : arrafi25@yahoo.com

SINCE 1979
AR-RAFI & CO.
Creating Recognition

New Vol. No. 71 ■ 10th Issue
Fortnightly

The AHMADI

30 November, 2008 ■ Tk. 10.00
রেজি ঃ নং-ডি, এ-১২

ধানসিড়ি

১০০% খাঁটি সরিষার তৈল

ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈলের গুণাবলী

নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় উন্নতমানের সরিষা থেকে ঘানিতে প্রস্তুতকৃত ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈল। ফুডগ্রেড পি ই টি বোতলে বাজারজাত করা হয়। ধানসিড়ি খাঁটি সরিষার তৈল কোলেস্টেরলমুক্ত তাই এটি স্বাস্থ্যকর।

খাঁটি গাওয়া ঘি

ধানসিড়ি

ধানসিড়ি খাঁটি গাওয়া ঘি-এর গুনাবলী

গরুর দুধের টাটকা ক্রীম দিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে তৈরী। পোলাও, বিরিয়ানী, কোরমা, হালুয়া বা যে কোন সুস্বাদু খাদ্য তৈরীতে ধানসিড়ি গাওয়া ঘি অতুলনীয়।

ধানসিড়ি

রেস্তোরা ১ নীচতলা
রোড নং ৪৫ প্লট ৩২/১,
গুলশান ২, ঢাকা ১২১২।
ফোন ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫১৯২২

ধানসিড়ি

খাবার
অর্কিড প্লাজা (রাপা প্লাজার পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন ৯১৩৬৭২২

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
Crest
Trophy
Sign Board
Metal Sign
Acrylic Letter
POP & Interior
Digital Printig

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz

Specialist in Making Metal Crest, Trophy, Medal, Silver/Gold Coated Dish Model, Coat Pin, Key Ring, Plastic Sign, Poly Sign, Wooden & SS Febrication

A Home of Quality Crest Trophy & Gift Items

DHAKA HEAD OFFICE
H - 79, Block # H / 11 (1st Floor), Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

Printed and Published by Muhammad F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh
Editor in Charge: Mohammad Habibullah
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com